বিজ্ঞান অন্বেষক

ISSN 2582-5674
RNI : WBBEN/2003/11192

বর্ষ -২০ সংখ্যা-১
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৩
মূল্য : ২০ টাকা

নোবেল : ২০২২

ভিতরের পাতায়

★ নোবেল : ২০২২ ★ বিজ্ঞান একনজরে ফিরে দেখা : ২০২২ ★ জলবায়ু পরিবর্তন
★ বিজ্ঞানী হার্ভে ★ মেছোবিড়াল ★ নদী : ব্রাহ্মণী , কোপাই ও কুশকর্ণী ★ মহাকর্ষীয় তরঙ্গ
★ কুস্তুরী মৃগ ★ ছাতারে পাখি ★ নীল পাহাড়ের রাজা ★ মানব জাতি কি অবলুপ্তির পথে
★ প্রথম ভারতীয় আকাশচারী ★ সংবাদ ★ যারা হারিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

প্রবীর বসু

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, চন্দন সুরভী দাস, দীপাঞ্জন দে, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, তুষার নাথ, শতাব্দী দাশ, সোমা বসু, অর্চন সমাদ্দার, উজ্জ্বল কান্তি রায়

উপদেষ্টামণ্ডলী

সমর বাগচী, শঙ্কর নাথ, দীপক কুমার দাঁ, ভবানীপ্রসাদ সাহু, সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, রাজা রাউত, তপন দাস, মানসপ্রতীম দাস, সুমিত্রা চৌধুরী, জয়শ্রী দত্ত, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তপন সাহা

: website :

www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

: e-mail :

bigyanannesak1993@gmail.com.

: Whatsapp No. :

9830676330 / 9143264159/7980121478

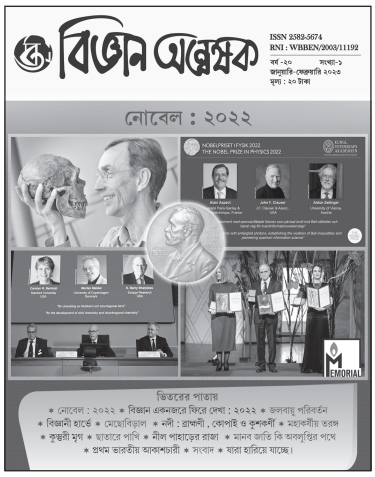

তাহাদের কথা

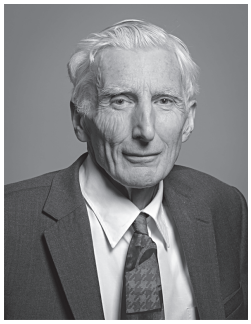

মার্টিন রীস

ব্রিটিশ কসমোলজিস্ট এবং জ্যোতিঃপদার্থবিদ
১৫তম রাজজ্যোতির্বিজ্ঞানী (অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল রয়্যাল)
২০০৪ থেকে ২০১২ পর্যন্ত তিনি রয়্যাল
সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন।

আমাদের প্রত্যেকের দেহ মোটামুটিভাবে $১০^{২৮}$ থেকে $১০^{২৯}$ টি পরমাণু দিয়ে তৈরি। এই 'মানব স্কেল'টি সংখ্যার নিরিখে পরমাণু ও নক্ষত্রদের ভরের মাঝামাঝি। যতগুলো পরমাণু দিয়ে আমাদের শরীর গঠিত সূর্যের ভরের সমান হতে প্রায় ততগুলি দেহ প্রয়োজন। অথচ হাজার কোটি নক্ষত্রের সমাহারে তৈরি গ্যালাক্সির নেহাতই একটা মামুলি নক্ষত্র হল আমাদের সূর্য। একটি গ্যালাক্সিতে যতগুলি নক্ষত্র থাকে আমাদের চোখে দেখতে পাওয়া মহাবিশ্বে কমপক্ষে ততগুলি গ্যালাক্সি তো হবেই। অর্থাৎ আমাদের টেলিস্কোপের সীমার মধ্যেই $১০^{৭৮}$-এর বেশি পরমাণু রয়েছে।

জীবদেহ হল পরপর কতগুলি জটিল গঠনের স্তরের সমন্বয়। পরমাণুরা জোট বেঁধে সেখানে জটিল অণু তৈরি করে; এরা আবার প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জটিল পথে ক্রিয়াবিক্রিয়া করে, আর এভাবেই একটি গাছ, একটি পতঙ্গ বা একটি মানব দেহের মতো আভ্যন্তরীণ এক পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মহাজাগতিক মহাবিশ্ব থেকে শুরু করে আণুবীক্ষণিক জগতের মধ্যেই আমাদের পদচারণা — যার আকার সূর্যের ১০০ কোটি মিটার ব্যাস এবং একটি অণুর এক মিটারের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ ব্যাসের মধ্যে। প্রকৃতি যে এই মধ্যবর্তী স্কেলে তার সর্বোচ্চ জটিলতা অর্জন করেছে এটা আসলে কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। একটি বাসযোগ্য গ্রহে এর চেয়ে বড়ো কিছু হলে সেখানে অবশ্যই মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা ভাঙ্গন বা চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার ঝুঁকি থাকত।

আমরা জানি যে আণুবীক্ষণিক জগতের দ্বারাই আমাদের দেহ সৃষ্ট, যেখানে এক মিটার দৈর্ঘ্যের দশলক্ষ ভাগের একভাগ আকারের ভাইরাসের প্রভাবে আমাদের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে এবং ক্ষুদ্র DNA ডাবল হেলিক্স অণু আমাদের সমস্ত জীনগত ঐতিহ্য বহন করে। এই ঘটনাগুলি একেবারে সংশয়াতীত ভাবে সুস্পষ্ট, ঠিক যেমন সূর্যের শক্তির ওপর আমাদের নির্ভরশীলতার ব্যাপারটি অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই দীর্ঘতর স্কেলের বিষয়টি? সবচেয়ে কাছের নক্ষত্ররাও তো সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষগুণ বেশি দূরবর্তী এবং তারপরেও আরও কয়েক কোটিগুণ দূর পর্যন্ত এই মহাবিশ্ব বিস্তৃত বলে মনে করা হয়। তাহলে আমাদের সৌরমণ্ডলের চেয়ে দূরে এতকিছু আছে কেন আমার কি বুঝতে পারবো?

ISSN 2582-5674

9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৭৯৮০১২১৪৭৮/৯২৩১৫৪৫১৯১/৯৪৩২৩৩৫৮৮২/৮৯৪৪৯৯৬৭৫৫/৭০০১৩৩৭৭১৪

সূচি

৩ শারীর বিজ্ঞানে নোবেল
ডা. শঙ্কর কুমার নাথ

৬ পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল
রতন দেবনাথ

৭ রসায়নে নোবেল
তপন দাস

MEMORIAL

৯ নোবেল শান্তি পুরস্কার
সুজাত ভদ্র

১০ জলবায়ু পরিবর্তন
সমর বাগচি

১২ বিজ্ঞানী হার্ভে
অভিষেক মান্না

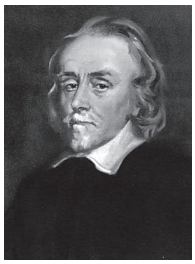

১৪ মেছো বিড়াল
অজয় মজুমদার

১৬ ব্রাহ্মণী ও কোপাই নদী
ড. উৎপল অধিকারী ও ড. সুনাম চ্যাটার্জী

২০ মহাকর্ষীয় তরঙ্গ
বরুণ কুমার দত্ত

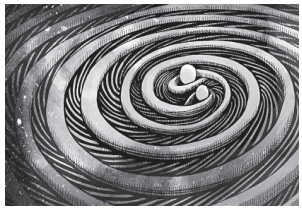

২১ কস্তুরী মৃগ
নিলয় মণ্ডল

২২ ছাতারে পাখি
অমর কুমার নায়ক

২৫ নীল পাহাড়ের রাজা
জয়তী ঘোষ

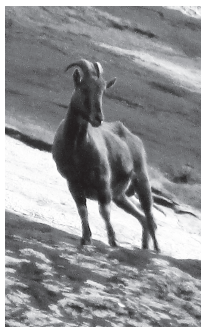

২৭ মানব জাতি কি অবলুপ্তির পথে?
প্রবীর বসু

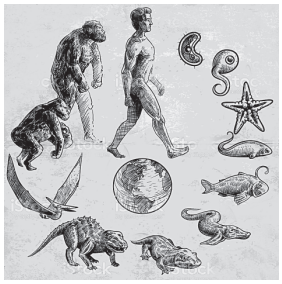

২৯ প্রথম ভারতীয় আকাশচারী
ড. উৎপল মুখোপাধ্যায়

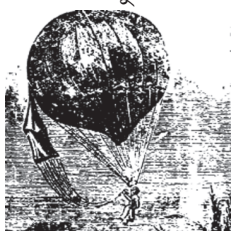

৩১ কুশকর্ণী নদী
শিবম ব্যানার্জী

৩২ সংবাদ

২য় প্রচ্ছদ
যে আবিষ্কারগুলি আমাদের নতুন করে ভাবায়

৪র্থ প্রচ্ছদ
যারা হারিয়ে যাচ্ছে

ড. শঙ্করকুমার নাথ

শারীরবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন সভান্তে পাবো

২০২২ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা শারীরবিজ্ঞান বিভাগের নোবেল পুরস্কার পেলেন ড. সভান্তে পাবো (Svante Pääbo)। নোবেল কমিটি থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাওয়া হোমিনিনদের জিনোম আবিষ্কার এবং সেই সংক্রান্ত মনুষ্য-বিবর্তনের দিশা দেখানোর জন্য। আসলে তিনি যে-কাজটি করেছেন, তা যুগান্তকারী, যেখানে তিনি খুঁজে বার করেছেন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রজাতি হোমিনিনদের সঙ্গে আজকের মানুষের যোগসূত্র।

পাবোর মূল কাজ

আমরা দেখে নিই, ১৯৯০ সালে পাবোর সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত গুপ্তধন খুঁজে পাবার কাহিনি। তিনি তখন অধ্যাপনা করছিলেন মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর গবেষণার লক্ষ্য, মানবজাতির পূর্বপুরুষ নিয়ানডার্থালদের চল্লিশ হাজার বছর আগের একটি জীবাশ্ম থেকে মাইটোকনড্রিয়াল ডিএনএ নিষ্কাশন করা; কাজটা কঠিন ছিল, কারণ ডিএনএ পাওয়া যায় মূলতঃ দুজায়গা থেকে, কোষের নিউক্লিয়াস থেকে এবং মাইটোকনড্রিয়া থেকে। নিউক্লিয় ডিএনএ অনেক তথ্য জানান দিলেও, তা সংখ্যায় খুবই কম, অপরদিকে মাইটোকনড্রিয়াল ডিএনএ তথ্য কম জানালেও, তা সংখ্যায় অনেক বেশি। আর আমরা সবাই জানি, হাজার হাজার বছরের নানান ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এইসব ডিএনএ ক্রমশই নষ্ট হতে থাকে। এক্ষেত্রেও সেই আশঙ্কা থেকে গেছিল। হাল ছাড়েননি পাবো, নিত্য-নতুন পদ্ধতির প্রয়োগে তিনি ডিএনএ বার করে ফেললেন।

আমাদের পূর্বপুরুষ

তাহলে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের একবার দেখে নিই, ওরা পৃথিবীতে কোন সময়ে বাস করত।

হোমোইরেক্টাস : ১৮ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ বছর আগের সময়ে।

হোমোহাইডেলবার্গেনসিস : ৬ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ বছর আগের সময়ে।

হোমোনিয়ানডার্থালেনসিস : ২.৫ লক্ষ থেকে ৩০ হাজার বছর আগের সময়ে।

হোমোস্যাপিয়েন্স : ১ লক্ষ বছর আগে থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

এইসব দেখেশুনে আমাদের মনে সহজেই সেই চিরন্তন প্রশ্ন ওঠে নিয়মিত যে, আমরা (বর্তমান মানুষ) কোথা থেকে এলাম, কীভাবে এলাম, কোন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এলাম, আমাদের সঙ্গে ওই পূর্বপুরুষদের কীই বা সম্পর্ক।

হোমোইরেকটাস : এদের মনে করা হয় বর্তমান মানুষের প্রথম মানব-সদৃশ প্রজাতি (হোমিনিন)। হাত ছোট, পা লম্বাওয়ালা এই প্রজাতি আফ্রিকায় থাকত, সেখান থেকেই অন্য মহাদেশে এরা ছড়িয়ে যায়। এরা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে হাঁটা-চলা করতে পারত (হোমো অর্থাৎ মানুষ, ইরেকটাস অর্থাৎ খাঁড়া হয়ে দাঁড়ানো)। অনেকে মনে করেন, এরাই প্রথম খাবার রান্না করতে শেখে। তবে এরা কথা বলতে পারত কিনা, তা জানা যায় না। এই প্রজাতি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যায় সম্ভবত আবহাওয়া পরিবর্তনের বিপর্যয়ে। ১৯৩০ দশকে হোমোইরেকটাসের শেষ অবশেষ আবিষ্কৃত হয় জাভার গ্যানডঙ-এ সোলো নদীর কাছে।

হোমোহাইডেলবার্গেনসিস : প্রথমদিকে মনে করা হয়েছিল যে, এই প্রজাতি, হোমোইরেকটাস প্রজাতির থেকে উদ্ভব হয়েছিল। পরে আরও গবেষণায় জানা যায় যে, হোমোহাইডেলবার্গেনসিস সম্পূর্ণ একটি আলাদা প্রজাতি বা হোমিনিন। এদের মধ্য-প্রিস্টোসিন যুগে দেখা গেছে। এই প্রজাতির প্রথম জীবাশ্ম পাওয়া গেছিল ১৯০৭ সালে জার্মানির হাইডেলবার্গ অঞ্চলে, তাই অমন নাম হয়েছে। এরা ইউরোপে, আফ্রিকায় বাস করত, আগুনের ব্যবহার জানত, গুহায় থাকত, সুঁচোল পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত। মনে করা হয়, এরা হয়ত কোন আদি ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে পারত। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এরাও লুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবীর আবহাওয়ার বিপর্যয়ে।

হোমোনিয়ানডার্থালেনসিস : ৩০ হাজার বছর আগেও এই প্রজাতির পূর্বপুরুষ পৃথিবীতে ছিল। জার্মানির উত্তর অঞ্চলে ১৮৫৬ সালে নিয়ানডার্থাল উপত্যকাতে এই প্রাচীন মানুষের ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া যায়। জায়গার নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। এরা আগুনের ব্যবহার জানত, গুহায় থাকত, বহু খাবারই রান্না করে খেত, বড় বড় পশু শিকার করত, ফলে অনেক উন্নত ধরনের অস্ত্র তৈরি করতে পারত ব্যবহারের জন্য। মাংস তো খেতই, এমনকি উদ্ভিজ্জ খাদ্যও খেত। এরা প্রায় আধুনিক মানুষের মত কথা বলতে পারত। এরা ইউরোপ ও মধ্য-এশিয়ায় বসবাস করত। গবেষকরা বলছেন, আধুনিক মানুষের আগমনে এবং বাড়বাড়ন্তের ফলে নিয়ানডার্থাল- মানব ক্রমশই কোনঠাসা হয়েছে এবং অবশেষে অবলুপ্তির পথে চলে গেছে। তবে তারা আজও বেঁচে আছে আমাদের মধ্যে ডিএনএ-র মাধ্যমে। সেইসব কথাতেই আসব একটু পরেই।

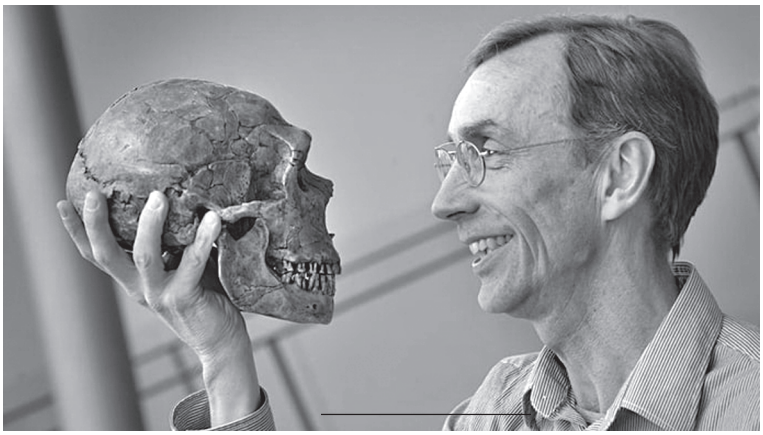

হোমোস্যাপিয়েন্স ঃ এরা হল আধুনিক মানুষ, আমি, আপনি সবাই।

এদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে রেখে বহুদিন ধরেই আলোচিত হয়েছিল। আর এইখানেই সভান্তে পাবোর সাধনা, তাদেরকে এক করলেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন এইসব প্রজাতিগুলির যোগসূত্রটি খুঁজে বার করবার, একেবারে মূলে গিয়ে। মূল মানে ডিএনএ বিশ্লেষণ করে।

জিনোম সিকোয়েন্স নিরূপণ করলেন পাবো

নিয়ানডার্থাল প্রজাতির জিনোম সিকোয়েন্স নিরূপণ করে পাবো বিশ্বের কাছে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সভান্তে পাবো জার্মানির লিপজিস-এ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এই প্রতিষ্ঠানে পাবো নিত্য-নতুন পদ্ধতি তৈরি করতে লাগলেন, যা দিয়ে প্রাচীন হাড়ের টুকরো থেকে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ডিএনএ-কে বিশ্লেষণ করা যায়। কাজটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। অবশেষে ২০১০ সালে তিনি বিশ্বে প্রথমবারের জন্য নিয়ানডার্থালজিনোম সিকোয়েন্স নিরূপণে সফল হলেন। এরপর তাঁর গবেষণার গতি বাড়ল—আর অবাক কাণ্ড, বিশেষভাবে জানা গেল, নিয়ানডার্থাল এবং বর্তমান মানুষ উভয়েরই আদিপুরুষ হল একই। প্রায় ৮ লক্ষ বছর আগে এই উভয় হোমিনিন এই পৃথিবীতে বাস করছিল। তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। ফলে আজও বর্তমান মানুষের মধ্যে নিয়ানডার্থালের ১-৪% জিনোম খুঁজে পাওয়া যায়। এটি নিঃসন্দেহে পাবোর একটি সাড়া জাগানো আবিষ্কার। পাবোর এইসব গবেষণা এক নতুন বিভাগের দ্বার খুলে দিয়েছে, যাকে এখন আমরা বলছি, 'প্যালিওজেনেটিক্স'-এ এক নতুন দিগন্ত, যা সন্ধান দিল প্রজাতিতে-প্রজাতিতে ছিল জৈবিক সম্পর্ক।

আরও একটি আদিম প্রজাতি 'ডেনিসোভান'

সাইবেরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে ডেনিসোভা গুহা থেকে ২০০৮ সালে খুঁজে পাওয়া গেল প্রায় চল্লিশ হাজার বছরের পুরোনো আদিম মানুষের একটি আঙুলের হাড়। সৌভাগ্যক্রমে এই হাড়ের মধ্যে, বিশ্লেষণ করবার পর, তার ডিএনএ অনেকটা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল। পাবোর গবেষণায় জানা গেল এটি আরও একটি প্রজাতির আদিম মানুষ, যাদের কথা আগে জানা ছিল না। এদের নাম দেওয়া হল ডেনিসোভান। পাবোর গবেষণায় এবার যুগান্তকারী এক সিদ্ধান্ত উঠে এল যে, এই ডেনিসোভানদের জিন আধুনিক মানুষের শরীরেও প্রবাহিত হয়েছে। এও জানা গেল, এর ফলেই পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলে বসবাসকারী বর্তমান মানুষ নানান ধরনের সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে এবং উঁচু পাহাড়ে কষ্টহীনভাবে বসবাস করবার শক্তি পেয়েছে। এর কারণ আধুনিক এই মানুষগুলির মধ্যে রয়েছে ডেনিসোভানদের থেকে পাওয়া জিন ইপিএএস১।

পাবোর জীবন

ড. সভান্তে পাবোর জন্ম ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের ২০ তারিখে সুইডেনের স্টকহোমে। পাবোর মা হলেন একজন এস্তোনিয়ান, কারিন পাবো (১৯২৫-২০১৩), বাবা সুইডিশ, সুনে বার্গস্ট্রম (১৯১৬-২০০৪), বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জন্ম সভান্তে পাবো-র। সভান্তের বাবা বার্গস্ট্রমও নোবেল লরিয়েট, তিনি শারীরবিদ্যা বিষয়ে (প্রেস্টাগ্ল্যান্ডিন বিষয়ে গবেষণা) নোবেল পুরস্কার পান ১৯৮২ সালে। সভান্তে পাবো বিশ্বের প্রখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন, কাজ করেছেন। জনপ্রিয় পুস্তকও লিখেছেন—'Neanderthal Man : In Search of Lost Genomes'। ১৯৮৬ সালে উপশালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করা তাঁর PhD-এর থিসিসটির বিষয় ছিল মানবকল্যাণমুখী, 'How the E19 protein of adenoviruses medulates the immune system'। বর্তমানের বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ (এখন ক্ষয়িষ্ণু) Covid-19 বিষয়েও গবেষণা করেছেন পাবো তাঁর প্যালিওজেনেটিক্স-কে কাজে লাগিয়ে, শিরোনাম ছিল, 'The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals'। এটি প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্বখ্যাত পত্রিকা Nature-এ ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। তাঁর সহগবেষক ছিলেন হুগো জেবার্গ। পাবো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটে তাঁর সহকর্মী গবেষক লিন্ডা ভিজিলান্ট-কে বিয়ে করেন ২০০৮ সালে, তাঁদের এক পুত্র, এক কন্যা। সারাজীবন তাঁর অসংখ্য

কর্মকান্ডের জন্য বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকটি বলি—'গটফ্রিড উইলহেম লিবনিজ পুস্কার' (১৯৯২); 'লুই জিঁজেট প্রাইজ ফর মেডিসিন' (২০০৫); 'গ্রুবের প্রাইজ ইন জেনেটিক্স' (২০১৩); 'ফরেন মেমবার অফ দি রয়েল সোসাইটি' (২০১৬); 'ডারউইন ওয়ালেশ মেডেল' (২০১৯); 'জাপান প্রাইজ' (২০২০); 'নোবেল প্রাইজ ইন মেডিসিন' (২০২২) ইত্যাদি।

আমরা তাঁর আরও মানবকল্যাণকর গবেষণার দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে রইলাম।

আমরা সবাই এক

পাবোর গবেষণার প্রেক্ষিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে।

'ওয়ার্ড হিউম্যান জিনোম প্রোজেক্ট' শুরু হয় ১৯৯০ সালের অক্টোবরে। মূলতঃ ফ্র্যান্সিস কলিন্স এবং ক্রেগ ভেন্টার-এর নেতৃত্বে হিউম্যান জিনোম প্রোজেক্টের কর্মকান্ডের সমাধা করা গেছে। ফল হিসেবে জানা গেছে, বিশ্বের সব মানুষের শরীরে পাওয়া জিনোমগুলির ৯৯.৯ শতাংশের সবই হুবহু একরকম। তাহলে মানুষে মানুষে পার্থক্য হল মাত্র ০.১ শতাংশ। এই তথ্যের ফলে প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে আসে সেই অমোঘ প্রশ্ন : শুধুমাত্র এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের তফাতের কারণে আমরা আলাদা আর তারজন্যই আমরা বিশ্বের মানুষ জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি করছি, কাটাকাটি করছি, দ্বেষ, হিংসা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়ে রেখেছি। কেন আমরা মনে করতে পারি না যে বিশ্বের সমস্ত মানুষের ৯৯.৯ শতাংশ হুবহু এক। মানুষে-মানুষে শান্তির বাতাবরণ তো ঐখানেই লুকিয়ে।

লেখক ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: sankarku_nath@yahoo.co.in • M. 9433309056

বিজ্ঞান ও বইমেলা

বাদকুল্লা বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত বিজ্ঞান ও বইমেলা ২৫-২৯ ডিসেম্বর বাদকুল্লা ইউনাইটেড অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী সেমিনার, ক্যুইজ, বিতর্ক ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ বিজ্ঞানের বইয়ের স্টল দেওয়া হয়। প্রতিদিনই বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

শিশু বিজ্ঞান উৎসব : উত্তর চব্বিশ পরগণা

পঃ বঃ বিজ্ঞান মঞ্চ, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শিশু বিজ্ঞান উৎসব উপসমিতির সহায়তায় এবং ডিরোজিও বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে স্বাধীনতার ৭৫ বছরে সবার দেশ আমাদের ভাবনায় বিজ্ঞান অভিযান ২০২২-২৩ এর অঙ্গ হিসাবে শিশু বিজ্ঞান উৎসব (১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০২২) অনুষ্ঠিত হয় শ্যামনগর বালিকা বিদ্যালয়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলছেন প্রধান অতিথি সৌরভ চক্রবর্তী।

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

২ নং ডেকার্স লেন, রবি সাহা, কলকাতা-৬৯ M. 8961066724 • স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া M. 9332280602 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায় , বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার , বনগাঁও M. 8637847365, অজয় মজুমদার M. 8918824281 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর , রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও M. 8116480129, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, বামা পুস্তকালয়, M. 9434570130 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • সারথী চন্দ, শিলিগুড়ি, M. 9674031082 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, M. 9609844676/7908341942 • ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, M. 9635995476 • দীপাঞ্জন দে, কৃষ্ণনগর ও চাপড়া, M. 9734067466 • বহরমপুর রেলওয়ে বুক স্টল ও বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, M. 9474350231 • তাপস কুমার প্রামাণিক, নোভা, কলকাতা M. 9836133980 • দিলীপ দাস, বিজ্ঞান ভাবনা, বহরমপুর M. 8926454316

রতন দেবনাথ

পদার্থবিদ্যায় নোবেল : ২০২২

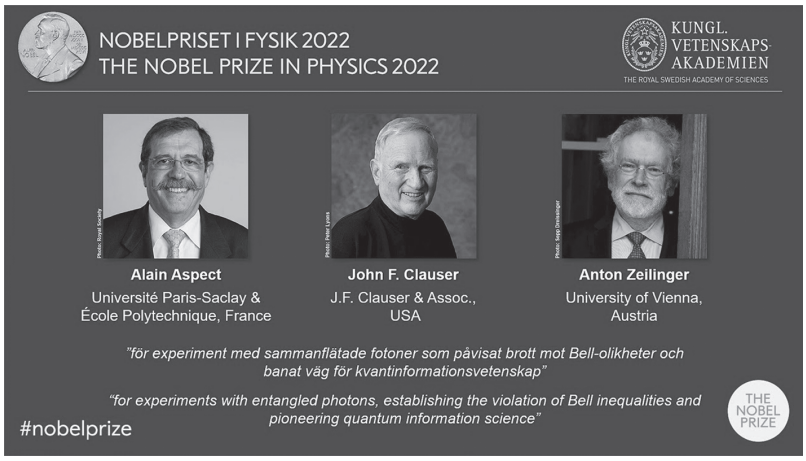

২০২২ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন জন বিজ্ঞানী। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সংক্রান্ত যুগান্তকারী গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবেই তাঁদের এই পুরস্কার। এই তিন জন বিজ্ঞানী হলেন অ্যালেন আসপেক্ট, জন ক্লজার এবং অ্যান্টন জেলিঙ্গার। অ্যালেন আসপেক্ট প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সিটিউট ডি'অপটিক গ্রাজুয়েট স্কুলের অধ্যাপক, জে এফ ক্লজার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস (আমেরিকা)-এর গবেষক পদার্থবিদ জন ক্লজার এবং ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যান্টন জেলিঙ্গার।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পদার্থবিদ্যার একটা বিভাগ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা যেমন, ইলেক্ট্রন, ফোটন ইত্যাদি যে নিয়মের অনুশাসন মেনে চলে তা কোয়ান্টাম বলবিদ্যারই অধীত বিষয়। সনাতন পদার্থবিদ্যা থেকে একটু যেন আলাদাই এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। একটা পাথরকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে পাথরটা সর্বোচ্চ কতটা উঁচুতে উঠবে তা হলফ করে বলে দিতে পারে সনাতন পদার্থবিদ্যার গতীয় সমীকরণ। অর্থাৎ এরকম ঘটনার ভবিতব্য সম্পর্কে নিশ্চয় করে বলে দিতে পারে সনাতন পদার্থ বিদ্যা। সেদিক থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা একটু অন্য ধরণের। পরমাণুর ভিতরে একটা ইলেকট্রনের অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিশ্চয়তার পরিবর্তে সম্ভাবনার কথাই বলে। এখানে কোন ঘটনার ভবিতব্য সম্পর্কে নিশ্চয়তার বদলে সম্ভাব্যতার কথাই বলা হয়।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার এক বিরাট সাফল্য গাঁটছড়া বাঁধা কণার ধারণার (entangled particles) প্রতিপাদন। গাঁটছড়া বাঁধা কণা ব্যাপারটা কেমন? দুটো কণা যদি গাঁটছড়া বাঁধা হয় তবে তাদের একটির কোন ধর্ম জানা গেলে অন্যটির সেই ধর্মটিও জানা হয়ে যায় আর তা হয় অবিকল একরকম। দ্বিতীয় কণাটি যত দূরেই থাকুক না কেন তাদের ধর্মের মধ্যে কোন ফারাক হয় না। দুটো কণা যেন অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ। যেন ভূতুরে সংযোগ। তিরিশের দশকে আইনস্টাইন এবং তাঁর সহকর্মীরা ভাবনায় এনেছিলেন গাঁটছড়া বাঁধা কোয়ান্টাম কণার। ১৯৩৫ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, বরিস পোডোলস্কি এবং নাথান রোজেন কোয়ান্টাম গাঁটছড়ার তাত্ত্বিক ভাবনা সম্পর্কে প্রকাশ করলেন এক গবেষণা পত্র। সে সময়ে বিজ্ঞানীমহলে তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল এই ধারণার। ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। এমনকি স্বয়ং আইনস্টাইনও সন্দেহাতীত ছিলেন না বিষয়টি সম্পর্কে। ব্যাপারটা তাঁর মনে হয়েছিল ভূতুরে কান্ড। সমস্ত জল্পনার অবসান করলেন জন স্টুয়ার্ট বেল। ১৯৬৪ সালে উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের এই পদার্থবিদ কলমের এক খোঁচায় নস্যাৎ করলেন ভূতুরে কান্ড। তাঁর বিখ্যাত তত্ব 'বেল ইনইক্যুয়ালিটি'-তে তিনি দেখালেন সত্যিই গাঁটছড়া সম্ভব। জয় জয়কার হল কোয়ান্টাম বলবিদ্যার। আজকের দিনের কোয়ান্টাম বিপ্লবের মূলে রয়েছে বেল-এর এই তত্ত্ব। কোয়ান্টাম গাঁটছড়ার এক পরীক্ষামূলক প্রমাণের কথাও ভেবেছিলেন বেল। ভাবনাটা ছিল এরকম— ধরা যাক একটা জ্বলন্ত বৈদ্যুতিক বাল্ব থেকে দুটো ফোটন কণা (আলোর কণা) বেড়িয়ে বিপরীত দিকে চলে গেল। যদি ফোটন কণা দুটো গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে থাকে তবে তাদের কোন একটা ধর্ম যেমন, সমবর্তন-এর মধ্যে একটা মিল থাকবে তা তাদের মধ্যে দূরত্ব যতই হোক না কেন। বেল-এর এই ভাবনাকেই বাস্তবে রূপদান করেন ক্লজার। বেল-এর ভাবনার আট বছর পর ১৯৭২-এ ক্লজার দেখিয়েছিলেন সত্যিই ফোটন কণার গাঁটছড়া বাঁধা সম্ভব।

ক্লজারের পরীক্ষার ফাঁক-ফোকর বুজিয়ে ফোটন কণার গাঁট-ছড়া বাঁধার বিষয়টিকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন অ্যালেন আসপেক্ট। উৎস থেকে বেড়িয়ে যাবার পর গাঁট-ছড়া বাঁধা ফোটন কণার ধর্ম মাপার কাজটিকে তিনি আরও পরিশীলিত করে তুললেন।

আরও আধুনিক যন্ত্র নিয়ে অ্যান্টন জেলিঙ্গার এবং তাঁর সহযোগীরা এবার নামলেন গাঁট-ছড়া বাঁধা কণাকে কাজে লাগাতে। দীর্ঘ পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা ফোটন কণাকে কাজে লাগালেন টেলিপোর্টেশন-এর কাজে। টেলিপোর্টেশন হল এমন এক কাজ যার মাধ্যমে কোন এক কোয়ান্টাম অবস্থাকে এক কণা থেকে দূরের কোনও কণায় স্থানান্তর করা যায় কণাটিকে স্থানান্তর না করেই। জেলিঙ্গারের এই পরীক্ষা একদিকে যেমন কোয়ান্টাম তত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করল অন্যদিকে উন্মোচন করল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক নতুন দিক— কোয়ান্টাম প্রযুক্তি। যার ফলশ্রুতি হল কোয়ান্টাম কম্পিউটার, কোয়ান্টাম এনক্রিপসন। উন্মোচিত হল কোয়ান্টাম তথ্যপ্রযুক্তির এক নয়া দিক। এর ফলে কোয়ান্টাম কম্পিউটার সমাধান করবে এমন সব গাণিতিক সমস্যার যা সাধারণ কম্পিউটারের পক্ষে অসম্ভব। আর যোগাযোগের কাজ হবে আরও দ্রুত, নিখুঁত এবং অবশ্যই সুরক্ষিত।

লেখক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email:rdebnath1961@gmail.com • M. 9477934928

তপন দাস

একটি সবুজ রাস্তা

সুবিনয়বাবু মাঝে মাঝেই একা একা একমনে ভাবতে ভালোবাসেন। হাতড়ে বেড়ান নতুন নতুন তথ্য। এইতো সেদিন, নোবেল কমিটি তিনজন রসায়নবিদের নাম ঘোষণা করলেন নোবেল পুরস্কারের জন্য। সুবিনয়বাবু ডুবে রইলেন তাদের আবিষ্কারের বিষয় বুঝতে। আর মনে মনে ভাবছেন এরা তো কোন অংশেই কোন গোয়েন্দার চেয়ে কম নয়। শার্লোক হোমস বা ব্যোমকেশ সবই গিলে খেয়েছেন ছেলেবেলাতেই। আর এখানেও তাদের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন বিজ্ঞানীদের কাজে। শার্লোক হোমস থেকে শুরু করে ব্যোমকেশ যেকোনো গোয়েন্দা গল্পের পটভূমিকায় লক্ষ্য করা যায়, গোয়েন্দা প্রথমে অপরাধীকে ধরবার জন্য একটি নকশা প্রস্তুত করেন। অপরাধী নিশ্চিত চিহ্নিত হয়ে গেলে, গোয়েন্দা খুঁজে বেড়ান তার কাছে পৌঁছানোর পথ। রাস্তা হয়তো অনেক থাকে, কিন্তু তিনি বেছে নেন সেই পথটি যেখানে পৌঁছাতে সময় কম লাগবে, সবচেয়ে কম সংখ্যক মানুষকে যুক্ত করতে হবে এবং নিশ্চিতভাবে অপরাধীর কাছে পৌঁছানো যাবে। বিজ্ঞানীরাও একধরনের গোয়েন্দার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন তাদের পরীক্ষাগারে। প্রথম অবস্থায় বিজ্ঞানীদের কাজ হল, কোন জটিল সমস্যার সমাধান করা। সেই কাজে সফলতা লাভের চেষ্টা করে থাকেন যেকোন পদ্ধতিতে। অনেক ক্ষেত্রে এরকম অনেক জীবনদায়ী ঔষধ তৈরীতে তাদের উৎপাদন মুল্য অনেক বেশী পড়ে যায়। ফলে সকলের পক্ষে তা উপযোগী হয়ে ওঠে না। বিজ্ঞানীরা তখন খুঁজতে শুরু করেন বিকল্প কোন যৌগ। আবার অন্য দিকে, কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বনে মূল উৎপাদনের সাথে অনেক উপজাত যৌগ উৎপন্ন হয়। সেক্ষেত্রে তাদের ক্রোমাটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে পৃথক করা একটি কঠিন কাজ হয়ে পরে। ব্যয়িত হয় অনেক পরিশ্রম। স্বাভাবিক ভাবেই উৎপাদন মুল্য বেড়ে যায় কয়েকগুণ। শুধু তাই নয় বিভিন্ন দ্রাবক ব্যবহারে পরীক্ষাগারের পরিবেশ, পরিবেশ বান্ধব থাকে না। পরীক্ষাগারে গবেষকদের প্রতিদিন প্রতিনিয়ত গ্রহণ করতে হয় বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস। তাই সকলের চাহিদার কথা মাথায় রেখে খুঁজে চলে বিকল্প রাস্তা। বিকল্প রাস্তা খুঁজতে গিয়ে অনেকে সহজলভ্য বিকল্প যৌগ খোঁজেন। আবার অনেকে জটিল যৌগ উৎপাদনের জন্য খোঁজেন সহজ রাস্তা। ২০২২ এ নোবেল জয়ীদের তিন জন হেঁটেছেন সহজ রাস্তা খোঁজার পথ। খুঁজে বের করেছেন ক্লিক রসায়ন ও বায়ো- অর্থগোনাল রসায়ন।

এই দুই পদ্ধতিতেই বিজ্ঞানীদের নজরে ছিল মূলত পাঁচটি বিষয়ের উপর। বিক্রিয়ায় উৎপন্ন মুখ্য উপাদানের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, সাধারণ বিল্ডিং ব্লক অনুগুলোকে সহজে যুক্ত করা, উপজাত যৌগের উৎপাদন শূন্য করা, দ্রাবক থেকে উৎপন্ন যৌগকে সহজে পৃথক করা এবং পরিবেশ বান্ধব দ্রাবকে বিক্রিয়া সম্পন্ন করা। ক্লিক রসায়নে খুব সহজে দুটি অণুর ব্লক একসাথে জুড়ে গিয়ে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে। গাড়ি চালকেরা গাড়িতে উঠেই সবার প্রথমে সীট বেল্ট বেঁধে নেওয়াতে বা ইলেকট্রিক প্লাগ-এ মোবাইল চার্জার লাগানোর মতো ঘটনায় যেমন দুটো ব্লক একসাথে জুড়ে যায়, ঠিক তেমনি ক্লিক রসায়নেও সেরকমই দুটো ব্লক জুড়ে যায়। সাধারণ ভাবে দেখা গেছে ক্লিক রসায়নে অ্যাজাইড — অ্যালকাইন সাইক্লো সংযোজন বিক্রিয়া ঘটিয়ে ৫ সদস্যের ভিন্ন পরমাণু বিশিষ্ট রিং প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের সংযোজনে Cu(I) আয়ন অণুঘটকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে একদিকে যেমন লক্ষ্যের যৌগটি ১০০ শতাংশ উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে পুনঃকেলাসিকরণ বা ক্রোমাটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে মূল যৌগ পৃথকীকরণের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এই ক্লিক রসায়নের স্রষ্টা কার্ল বেরি শারপ্লেস।

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে " মৎস্য মারিব খাইব সুখে, পড়াশুনা করিব কীসের দুঃখে "। কিন্তু না, নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী শার্পলেস, ছোট বেলায় মৎস্য মারায় অতি উৎসাহী হলেও কিন্তু তিনি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। এমনকি মৎস্য মারাতেও সংখ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে প্রাধান্য দিতেন নতুন মাছের দিকে, যা আগে কোনদিন ধরতে পারেন নি। মাছমারায় বিড়াল তপস্বী এই বালকই বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি একদিন হয়ে উঠলেন একজন গবেষক। নজর দিলেন অপরিচিত যৌগ আবিষ্কার এবং নতুন সহজ পদ্ধতি আবিস্কারের দিকে। যে পাঁচজন বিজ্ঞানী দ্বিতীয় বারের জন্য নোবেল পুস্কারের তালিকায় নাম তুলেছেন তাদের একজন, যুক্তরাজ্যের কার্ল বেরি শার্পলেস। ২০২২ এ রসায়নে তিন নোবেল জয়ীর একজন আমিরিকার ক্রিপ্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর রসায়নবিদ শার্পলেস। ১৯৯৮ সালেই রসায়ন শাস্ত্রে ক্লিক রসায়ন নামে একটি নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। ২০০১ সালেই তিনি এবং তার সহ গবেষকেরা ক্লিক রসায়নের দিগন্ত উন্মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেন। আজ থেকে ৭০ বছর আগে বদ্ধ সংযোজনের পথ দেখিয়েছেন হুইসজেন ও তাঁর সহ গবেষকেরা। তিনি বদ্ধ সংযোজন ঘটাতে গিয়ে

Cu(I) ব্যবহার করেছেন, কিন্তু জলীয় মাধ্যমে এই অণুঘটকের জীবন সীমা খুবই কম। সেই সময় ১,২,৩ ট্রাই অ্যাজল প্রস্তুত করতে প্রায় ৮০° সেন্টিগ্রেড-এর বেশী তাপমাত্রা প্রয়োগ করতে হয়েছে। শুধু তাই নয় বিক্রিয়া সম্পাদনে অনেক ধাপ অতিক্রম করেও একটি রেসিমিক মিশ্রণ পাওয়া গেছে। রেসিমিক মিশ্রণে দুটি আলাদাভাবে আলোক সক্রিয় যৌগ পাওয়া যায়, যাদেরকে পৃথক করা অনেকটাই কঠিন কাজ। আজ ক্লিক রসায়নের পরিধি অনেকটাই বিস্তৃত। অণুঘটকের ধরনকে বদলে দিলেন। যৌগ উৎপাদনের জটিল পথকে সহজভাবে দেখানোর নতুন প্রয়াস গ্রহণ করলেন। শার্পলেস Cu(I) দ্রবণের সাথে ট্রাই ইথাইল অ্যামোনিয়া যোগ করেন। ফলে বিক্রিয়াটি কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রায় সম্পন্ন করা গেছে এবং শুধুমাত্র একটি সমাবয়বী যৌগই উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাই আজকের গবেষকেরা ক্লিক রসায়নকে ঔষধ বিদ্যা থেকে শুরু করে, ডেনড্রাইমার প্রস্তুতি, ন্যানো প্রযুক্তি সর্বত্রই কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁর দেখানো রাস্তার আরও একধাপ উন্নত করেছেন অনেকে। যেমন অনুঘটক বিহীন ক্লিক রসায়নের উৎপত্তি একটি ধাপ।

শার্পলেস যেসময় প্রথম বারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেতে চলেছেন সেই সময়কালেই কার্লসবার্গ ল্যাবরেটরিতে বসে প্রায় একই রকম কাজ করতে শুরু করেছেন মর্টেন মেল্ডাল। তাঁর প্রথম লক্ষ্য ছিল প্রযুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতির উন্নতিসাধন করা। আবার নতুন নতুন পথে অনু জোড়া দিতেও আবিষ্কার করেছেন বেশকিছু পথ। বিভিন্ন পলিমার সংশ্লেষ, পেপটাইড সংশ্লেষে যুগান্তকারী পথ দেখিয়েছেন তিনি। প্রায় সমসাময়িক সময়ে ডেনমার্কের রসায়নবিদ মর্টেনমেল্ডাল আলাদা ভাবে ক্লিক রসায়ন নিয়ে যে সংশ্লেষ রসায়নে নতুন পথ সুচনা করা যায় তাঁর দিশা দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর গবেষণাগারে ২০০১ সালে Cu(I) অণুঘটক ব্যবহার করে কঠিন দশায় বদ্ধ পেপটিডোট্রাইঅ্যাজল প্রস্তুত করতে সমর্থ হলেন। আমিরিকার সান দিয়াগোতে একটি আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে তাঁর কাজটি প্রাকাশিত হয়। ধীরে ধীরে এর প্রয়োগ ছড়িয়ে পরে রসায়নের অনেকগুলো শাখায়। জলীয় মাধ্যমে যেহেতু Cu(I) খুবই অস্থায়ী তাই তাঁরা খুঁজতে থাকেন আরও উন্নত রাস্তা। তাঁরা দেখলেন সোডিয়াম অ্যাসকরবেট (ভিটামিন সি) একটি উত্তম বিজারক দ্রব্য এবং এর প্রয়োগে আরও সহজে উপজাত উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে মূল উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিজ্ঞানী সেই কারণেই এবারের রসায়নের নোবেল পুরস্কারের ভাগ বসাতে পেরেছেন।

মাঝে মাঝে সুবিনয় বাবুর মনে হয় সবই তো আবিষ্কার হয়ে গেছে, আর নতুন কি হবে? আসলে বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে তাঁর নিজের ছন্দে। বিজ্ঞানী তাল মিলিয়ে চলছে সেই ছন্দে। যেমন শার্পলেস ও মেল্ডাল যে বিক্রিয়া করে দেখালেন পরীক্ষাগারের কাচের নলে, সেই বিক্রিয়া ক্যারিলন বারতজি প্রয়োগ করলেন জীবন্ত কোষে। রসায়নের নতুন শাখা বায়োঅর্থগোনাল বাংলায় বলা যায় জীবন্ত সমকোণ। কোন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জীবন্ত কোষে বাইরের কোন পদার্থ লম্বভাবে প্রবেশ করানো হয়, যে রসায়নে বায়ো অর্থগোনাল বিক্রিয়া বলা হয়। ক্লিক রসায়নের নতুন চিন্তা ভাবনাকে জৈবিক রসায়নে প্রয়োগ করা যায়, সেই পথকে নিশ্চিত করেছেন ক্যারিলন বারতজি। বারতজি চিনির অণুর সাথে অ্যাজাইড অণু যুক্ত করেছেন। দ্বিতীয় ধাপে এইভাবে উৎপন্ন চিনির অনু গ্লাইকেন এ প্রবেশ করিয়েছেন। তৃতীয় ধাপে বদ্ধ একটি অ্যালকাইনের সাথে ক্লিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাজাইডের সাথে যুক্ত করেছেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি সজীব কোষের কোষ পর্দায় ফ্লুরোসেন্ট সবুজ অনুকে কোশ প্রাচীরে প্রতিস্থাপনের জন্য ক্লিক রসায়ন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। এই আবিষ্কারের মাধ্যমে ক্যান্সারের মতো রোগের নিরাময়ে ঔষধ প্রয়োগের একটি নতুন পথ খুঁজে পাওয়া গেল। যা নিঃসন্দেহে চিকিৎসা শাস্ত্রে একটি যুগান্তকারী পথ, তা বলাই বাহুল্য। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষক নিমগ্ন ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সময় থেকেই একেবারেই মৌলিক কিছু করে দেখানোর। তারই একটি ফসল বায়োঅর্থগোনাল রসায়ন। গ্লাইকো বায়োলোজি সহায়তায় তিনি বিভিন্ন কারণে শারীরিক প্রদাহ, যক্ষার মতো রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার পদ্ধতি দেখিয়েছেন। কোভিড ১৯ এর মতো অতিমারিকালেও দিশা দেখিয়েছেন কোভিড ১৯ সনাক্তকরণের সহজ পথ। সহজ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় রসায়নে আবিষ্কৃত হল দুটি নতুন শাখা, যেখানে সহজ পদ্ধতিতে বেশী টেকসইয়ের জিনিস বানানো যাবে।

সুবিনয় বাবু মনে করেন তিন নোবেল জয়ীর দেখানো পথ সত্যি সবুজে মোড়া রাস্তা। এই রাস্তায় নেই কোন বাঁক একেবারেই সহজ সরল, গন্তব্যে পৌঁছানো যায় খুব তাড়াতাড়ি আবার বিষাক্ত গ্যাস

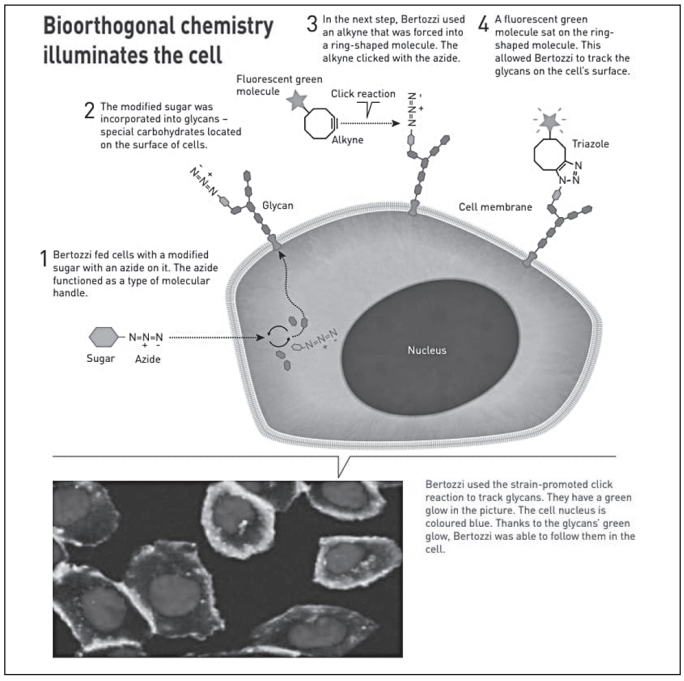

গুলোও নাকের কাছে আসে কম। তাঁর মতে এই তিন বিজ্ঞানীর দেখানো রাস্তা ধরেই চিকিৎসাবিদ্যায় আসছে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। মাত্র দুই দশক আগেই আবিষ্কৃত হওয়া এই পথগুলি অনুসরণ করতে শুরু করেছে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন শিল্প কারখানা। ক্যান্সার, এইডস্-এর মতো অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে সারা বিশ্বের মানব জাতি যে উপকৃত সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই নোবেল কমিটির জহুরিরা বেছে নিতে ভুল করেননি এই তিন রত্নকে।

লেখক প্রধান শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: tdcob25@gmail.com • M. 8944996755

সুজাত ভদ্র

নোবেল শান্তি পুরস্কার : ২০২২ মানবাধিকার

৭ অক্টোবর, ২০২২। নরওয়ের নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটি পূর্ব ইউরোপের একজন মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব ও দুটি মানবাধিকার সংগঠনকে ২০২২ সালের জন্য শান্তি পুরস্কার ঘোষণা করে।

সেপ্টেম্বর মাসে সংবাদে প্রকাশ হয়েছিল, বেশ কিছু ব্যক্তিকে প্রথামত বাছাই করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে ভারতের প্রাক্তন আমলা, সমাজকর্মী হর্ষ মান্দের ও তাঁর সংগঠন, কারওয়ান-ই-মহব্বৎ (Caravan of Love) আছে; আছেন Ali News-এর প্রতীক সিনহা ও মহম্মদ জুবের।

শেষমেশ ইউক্রেনে রাশিয়ার হানা সহ নানা ঘটনার আবহে প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব ও ধারাবাহিক সংগঠন চালিয়ে যাওয়ার জন্য, দুটি সংগঠনকে নির্বাচিত করা হয়।

অনেকের মতে, পিস কমিটির অতীত বেশ গোলেমেলে। মহাত্মা গান্ধীকে নির্বাচিত করেনি; কিন্তু বিপরীতে এমনকি হিটলারের নামও বিবেচনা করেছিল। বারাক ওবামার কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি "যুদ্ধ-বিরোধী" ভাষণের জন্য বাছাই করা হয়েছিল কিন্তু তার এক মাসের মধ্যেই তিনি আফগানিস্থানে বোমা বর্ষণ করার নির্দেশ দেন।

২০২২ সালে যারা পেলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরকম ঃ

১. বেলারুশের মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী এবং বর্তমানে জেলবন্দী Ales Bialiatskj (BIALIATSKJ)। ১৯৮০-এর দশক থেকে তিনি বেলারুশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। বয়স এখন তাঁর ষাট। ১৯৯৬ সালে তিনি বেলারুশে মানবাধিকার সংগঠন VIASNA গড়ে তোলেন ও বেলারুশ-এর স্বৈরাচারী শাসক/প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সংবিধান পরিবর্তনের নানা কুকর্মের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর ধারাবাহিক রাষ্ট্রীয় অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর সংগঠন VIASNA–"Spring" নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন ও অত্যাচারের কাহিনিগুলো লিপিবদ্ধ করেন। শত চাপের মধ্যে ও অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়েও দেশ ত্যাগ করেননি; ২০১১ সালে কর-ফাঁকির মিথ্যা মামলা এনে সাড়ে চার বছর কারাদন্ড দেওয়া হয়। যাতে তিনি আর নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারেন।

২০২০ সালে ভুয়া নির্বাচন বাতিলের দাবিতে জনবিক্ষোভের প্রতিটি ঘটনা, অত্যাচারের কাহিনি লিপিবদ্ধ করে। তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। নোবেল কমিটির ঘোষণায় বলা হয়েছে, তিনি তাঁর সারাজীবন মানবাধিকার রফার সপক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন ও তিনি একজন এমন ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন মানবাধিকারের জন্য।

দ্বিতীয় পক্ষে দেওয়া যে শান্তি পুরস্কার, সেটি রাশিয়ার সংগঠন, Memorial; ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে রাশিয়ার বেশ কিছু মানবাধিকার কর্মী এই সংগঠন গড়ে তোলেন, শাখারভও যুক্ত ছিলেন। তৎকালীন সমাজতন্ত্রে, "গুলাগ" পর্বে অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এই সংগঠন। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরে Memorial তাদের কাজ চালিয়ে যায় ও রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে আসছে। চেচনিয়াতে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর নানা অত্যাচারের কাহিনি এই সংগঠন প্রকাশ করে আসছে। ২০০৯ সালে Memorial-এর চেচনিয়ার অফিসে কর্মরতা চেচনিয়ার প্রধান Natalia Estemirova-কে রাশিয়ার বাহিনী হত্যা করে।

২০২১ সালে রাশিয়ার সুপ্রীমকোর্ট Memorial-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের সন্ত্রাসবাদী ও জঙ্গীদের মুখপাত্র সংগঠন হিসাবে তকমা মারে রাশিয়ার রাষ্ট্র।

তৃতীয়টিও সংগঠন. ইউক্রেনের মানবাধিকার সংগঠন—The Center for Civil Liberties. এদের মূল কাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। কয়েক বছর ধরে এই সংগঠন জনমত গড়ে তুলছিল যাতে ইউক্রেন আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যাল কোর্ট-এর ঘোষণায় স্বাক্ষর করে, যাতে তারা ইউক্রেনে ধারাবাহিকভাবে ১৯৮০-এর দশকে, ৯০-এর দশকে ইউক্রেন রাশিয়ার মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার চাইতে পারে উক্ত আন্তর্জাতিক আদালতে।

নোবেল কমিটি তাদের ঘোষণায় বলেছিল, এরা সবাই ইউক্রেন, বেলারুশ ও রাশিয়ায় "demonstrate the significance of civil society for peace and democracy."

লেখক মানবাধিকার কর্মী

M. 6289125398

স ম র বা গ চী

COP-২৭ এবং পৃথিবীর জলবায়ুর ২০২২ সালের বর্তমান অবস্থা

গত আটবছরের পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার রেকর্ড পূর্বের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এটা ঘটছে বায়ুমন্ডলে ক্রমান্বয়ে গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির ফলে। ওয়ার্ল্ড মেটিওরলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (WMO) তার ২০২২ সালের রিপোর্টে জানাচ্ছে যে তীব্র দাবদাহ, ক্ষরা ও বন্যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

আমরা বুঝতে পারছি জলবায়ু সংকটের প্রভাব। ১৯৯৩ সালের পরে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২০ সালের জানুয়ারির পর এই বছর সমুদ্রতল প্রায় ১০ মিমি উঁচু হয়েছে।উপগ্রহ দ্বারা ৩০ বছর আগে, যবে থেকে সমুদ্রতলের উচ্চতা মাপা শুরু হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সমুদ্রতলের বৃদ্ধি যা ঘটেছে তার ১০% ঘটেছে গত আড়াই বছরে।

ইউরোপিয়ান আল্পসের হিমবাহ বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২০২২ সালে যা পুরানো রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।গত ২৬ বছর ধরে গ্রিনল্যান্ডের বরফের চাদর গলে যাচ্ছে।এই বছর সেপ্টেম্বরে সর্বপ্রথম গ্রিনল্যান্ডে বৃষ্টি পড়ল।

১৮৫০-১৯০০ সালের যে গড় তাপমাত্রা ছিল তার চেয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.১৫°C বৃদ্ধি পেয়েছে। লা নিনার তাপ যদি তিন গুণ কমে যায় তাহলে ২০২২ সালে পৃথিবী একের-পাঁচ বা একের-ছয় গুণ গরম হবে। কিন্তু, তা দীর্ঘকালীন কোন প্রবণতা হবে না। আরেকটা চরম গরম দিন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ১৮৫০-১৯০০-কে যদি শিল্প বিপ্লবের বেস লাইন ধরি তাহলে ২০১৩-২০২২ এই দশ বছরের গড় তাপমাত্রা ১.৪^{0}C বেশি হবে। এটা জানাচ্ছে Inter Governmental Panel on Climate Change (IPCC)। গত ২০ বছরের মধ্যে ২০২১ সালে সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি ছিল।

আফ্রিকার Sharm ElSheikh-এ যে COP27 হচ্ছে তার আগে WMO Provitional State of Global Climate in 2022 রিপোর্ট দিয়েছে। WMO এইরকম রিপোর্ট প্রতি বছর প্রকাশ করে। তা জলবায়ুর বর্তমান অবস্থা এবং তার যেসব চরম ঘটনার সম্ভাবনা এবং তার কি প্রভাব পড়বে তার আভাস দেয়। ২০২২-এর রিপোর্টে তাপমাত্রার যে খবর দিয়েছে তা সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত।পরের এপ্রিলে পুরো খবর পাওয়া যাবে। দুই সপ্তাহ প্রচন্ড আলাপ আলোচনার পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের COP 27 ২৩ তারিখে শেষ হল। ২০১৫ সালের ঐতিহাসিক প্যারিস সম্মেলনের পর এই সম্মেলন ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।কারণ, এই সম্মেলনে জলবায়ু বিপর্যয়ের আগে,বিপর্যয় যখন ঘটছে তখন এবং ঘটে যাওয়ার ফলে যেসব দেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন সব দেশকে বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য একটা ক্ষতিগ্রস্ত ভাণ্ডার 'Loss & Damage' সৃষ্টি করা হল। কিন্তু, একটা অন্য ব্যাপারে বিরাট বিপত্তি দেখা দিল। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে কোনোরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। অর্থাৎ, সেই এক পা এগিয়ে এক পা পেছোন। কি কারণে আগুন লাগছে তা জানার পরেও সেই কারণকে মোকাবিলা না করে, শুধু আগুন লাগলে তাকে মোকাবিলা করার আয়োজন করা। ২৭টা COP, তার আগে স্টকহোমে ১৯৭২, রিওতে ১৯৯২ এবং জোহানেসবারগে ২০০২ সালের বিশ্বসম্মেলনের পরেও বিশ্বতাপ বৃদ্ধি এবং তদ্‌জনিত জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবিলা করার জন্য সেরকম কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। তার মূল কারণ তেল, কয়লা ও গ্যাসের লবি, যা বর্তমান ভোগবাদী পুঁজিবাদী সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। আসলে, প্রকৃতি ও সমাজের আজ যে বিপর্যয় তাকে নতুন কোন প্রযুক্তি দিয়ে সামলানো যাবে না।তা সৌর শক্তিই হোক বা অন্য কোন নবীকরণযোগ্য শক্তি। যদি এই ভোগবাদী সমাজকে, তা পুঁজিবাদী হোক বা সমাজবাদী, পরিবর্তন করে এক সহজ, সরল জীবনযাপনপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে পৃথিবী থেকে মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বিশ্ব আজ ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। বিশ্বতাপ বৃদ্ধি এখন নজরের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু, আজকের বিশ্বের সবচেয়ে জরুরি ঘটনা হল বিশ্বতাপ বৃদ্ধি এবং তদ্জনিত জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তন রোখার যে টার্গেট, আমরা তার থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। সবচেয়ে বিপদজনক যে খবর তা হল যে যদিও মিথেন বাতাসে কমদিন থাকে, প্রায় ১২ দিন, কিন্তু CO_2 থেকে মিথেন ৩০ গুণ বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস।তা পারমাফ্রস্ট ও উত্তর মেরুর বরফ গলে যাওয়ার ফলে বেড়িয়ে এসে পৃথিবীকে অনেক তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত করছে।পৃথিবী বেশি উত্তপ্ত হওয়ার ফলে আরো বেশি বরফ গলে তাড়াতাড়ি মিথেন বেড়িয়ে এসে ফিড ব্যাক লুপ সৃষ্টি করে। এর ফলে এটা প্রায় নিশ্চিত যে আমরা ১.৫^{0}C টার্গেট ছাড়িয়ে যাব। যদি Business as Usual চলতে থাকে তাহলে ২^{0}C টার্গেট অর্জন করাও অসম্ভব হবে। এইভাবে চললে ২.৫ থেকে ৩-ডিগ্রি তাপমাত্রায় পৌঁছে যাব।

কেউ কেউ বলছেন যে কয়লার ব্যবহার শূন্য করতে যে সময় লাগবে সেই সময়ে কিছুদিনের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু, প্রাকৃতিক গ্যাসের যে পরিকাঠামো তার থেকে প্রচুর মিথেন বেরোয়। এর ফলে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে যে সুবিধে পাওয়া যাবে তা মিথেন বহির্গমনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে থেকে নিয়মিত বাতাসে মিথেনের পরিমাণ মাপা হচ্ছে। WMO জানায় যে ২০২১ সালে মিথেনের পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু, এই বৃদ্ধি কেন ঘটল তা WMO চেপে যায়। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে পরিস্রুত প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লার চেয়ে ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি খারাপ।আমেরিকার Environment Protection Agency (EPA) জানাচ্ছে যে আমেরিকায় যত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয় তার ১.৪% বাতাসে বেড়িয়ে যায়। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানাচ্ছে যে ঐ গ্যাস লিক ৬ থেকে ৯ গুণ বেশি। মিথেনের লিক যদি ২.৫%-ও হয় তাহলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবিধেকে নষ্ট করে দেবে। মনে রাখতে হবে আমেরিকাতে যে তেলের লবি আছে যারা বিশ্বতাপ বৃদ্ধি যে মানুষ সৃষ্টি করছে না তা নানারকম যুক্তি দিয়ে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে। ইউক্রেন যুদ্ধের সময় আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (EU) বিশ্বতাপ বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাদের চালাকি বোঝা যায়। সেই সময়ে তেলের

সংকটের জন্য EU কিছু কয়লার প্লান্ট চালু করে। তারা বলতে শুরু করে যে আফ্রিকা তেল ও গ্যাস পরিকাঠামো চালু করতে পারে যদি তা ইউরোপকে সরবরাহ করা হয়।কিন্তু, আফ্রিকাকে পরিশ্রুত নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতে হবে।

David Wallace Wells তাঁর 'An uninhabitable Earth' গ্রন্থে বলছেন যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৮° সেলসিয়াসে উঠে যেতে পারে যদি সমাজ একই ভাবে চলতে থাকে। ভোগবাদী শিল্প সভ্যতা এইভাবে চললে স্ট্যানফোর্ড, প্রিন্সটন ও বারক্লের বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে ষষ্ঠ গণবিলুপ্তি আসবে এবং মানব প্রজাতি সবচেয়ে আগে বিলুপ্ত হবে।রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট'-এ লিখছেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। বর্তমান লেখক তো আর মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছে না। মানুষের মত এত নির্বোধ প্রজাতি প্রকৃতি আর কখনো জন্ম দিয়েছে বলে মনে হয় না যে নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে।

লেখক পরিবেশ কর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email:samar.bagchi@yahoo.com • M. 9433526839

অ ভি ষে ক মা ন্না

অবিস্মরণীয় বিজ্ঞানী হার্ভে : জন্মের ৪৪৪ বছর

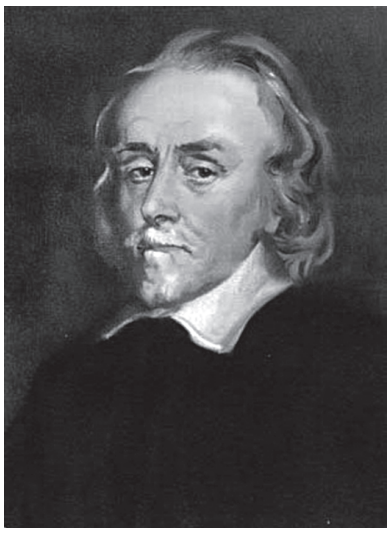

মানবদেহ রক্ত সংবহনের গুরুত্ব কতটা তা আর আজ আমাদের কারোরই অজানা নয়। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানবদেহের হৃদপিণ্ডের ভূমিকার কথা বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা ছিল। সেই যুগে মনে করা হতো শরীর ঈশ্বরের দান, তাই মৃতদেহ নিয়ে কাটাছেঁড়া করাটাও ছিল অপরাধের সমান। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চিই সর্বপ্রথম তার আঁকার মধ্য দিয়ে মানব দেহের অঙ্গ তন্ত্র সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ছাপ রেখে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত চিকিৎসক অ্যান্দ্রিয়া ভেসালিয়াস (১৫১৪-১৫৬৪) মৃত মানুষের শরীর কেটে কেমন ভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে তা ছবি এঁকে শিখিয়েছিলেন নিজের ছাত্রদের। তবে এই "অপরাধের" জন্য ভেসালিয়াসের জীবনে নানা দুর্ভোগ নেমে এসেছিল।

এইসব ঘটনা জেনেই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক তরুণ উইলিয়াম হার্ভে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাচর্চার কেন্দ্র ইটালির পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়তে এলেন। আজ থেকে ঠিক ৪৪৪ বছর আগে ১লা এপ্রিল ইংল্যান্ডের ফোকস্টোনে তার জন্ম। হার্ভের বাবা ছিলেন সম্পন্ন কৃষক সেই সাথে শহরের মেয়র। হার্ভে তার সাত ভাইয়ের মধ্যে সবথেকে বড়। বাবার আশা ছিল ছেলে তার জমি জায়গা, ব্যবসা দেখাশোনা করবে। কিন্তু কোথায় কি? বিষয় সম্পত্তিতে হার্ভের কোনো আগ্রহই নেই। তার ধ্যান-জ্ঞান ডাক্তারী পড়া। সেই সময় মূলত প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেনের (১২৯-২১৬) অবদানই শিক্ষার্থীদের পড়ানো হতো। অথচ হাতের কাছে থাকা সদ্য আবিষ্কৃত ভেসালিয়াসের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব এবং তথ্য ছিল ব্রাত্য!

১৬০২ সালে ডাক্তারি পাশ করে হার্ভে লন্ডনের চিকিৎসক হিসেবে ফিরে এলেন ও কেমব্রিজে অধ্যাপনায় যোগ দিলেন। চিকিৎসক হিসেবে খুব দ্রুত তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ইংল্যান্ডের রাজার চিকিৎসক নিযুক্ত হলেন তিনি। বিখ্যাত দার্শনিক সুপন্ডিত স্যার ফ্রান্সিস বেকন নিজের চিকিৎসার জন্য তার ওপরে ভরসা করলেন। অভিজাত মহলে তখন তার ভীষণ নামডাক। ঐতিহ্যবাহী "রয়েল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস" গর্বের সঙ্গে তাকে সদস্য পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালো। তখন হার্ভের বয়স মাত্র ৩২ বছর। কিন্তু শুধু ডাক্তারী বা অধ্যাপনায় হার্ভে থেমে থাকবেন কেন? তার মূল নেশা যে গবেষণা। আরো ভালো করে বললে রক্ত নিয়ে গবেষণা! ছেলেবেলায় পড়েছিলেন অ্যারিস্টটলের কথা। তার বক্তব্য ছিল শরীরের মূল শক্তির জোগান আসে রক্ত থেকে। সেই সময়ে জানা ছিল হৃদপিণ্ডে রয়েছে চারটি প্রকোষ্ঠ। সারা দেহে রয়েছে অজস্র শিরা ও ধমনী। ডাক্তারী পড়াকালীন তার শিক্ষক ফ্যাব্রিজিও ক্লাসে জানিয়েছিলেন শিরাতে রয়েছে ভালভ। কিন্তু এদের সকলের মধ্যে যোগসূত্রটি ঠিক কি? সেটা তখনও কেউ বলতে পারেননি। কাজে নেমে পড়লেন হার্ভে। এই রহস্যের সমাধান তাকে করতেই হবে। ১৬১৫ থেকে ১৬২৮ সাল। দীর্ঘ ১৪ বছর। নিরলস অধ্যবসায়। নানাভাবে, নানা রকমের প্রাণীর দেহব্যবচ্ছেদ করেছেন এই সময়ে। মানুষ থেকে শুরু করে পোকামাকড়, ব্যাঙ, ইঁদুর, পাখি সব কিছু। এইভাবেই খুঁজে পেলেন অদ্ভুত সব তথ্য। সব প্রাণীদের ক্ষেত্রে হৃদপিন্ডের কাজের মধ্যে রয়েছে আশ্চর্য মিল!

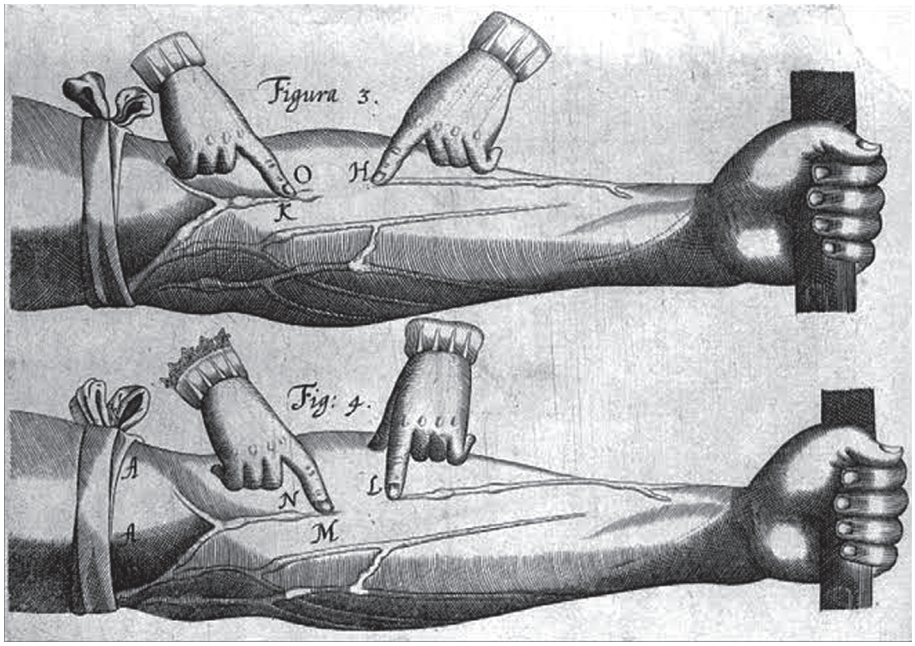

১৬২৮ সালে প্রকাশিত হল একটা বই। "অন দ্য মোশনস অফ হার্ট অ্যান্ড ব্লাড ইন অ্যানিম্যালস" ("দ্য মোটু কর্ডিস এট সানগুইনিস")। বইটির মুখবন্ধে তিনি লিখছেন, "অ্যানাটমী সম্পর্কে আমি যা শিখেছি ও শিখিয়েছি সেটা কোন বই থেকে পাওয়া নয়,

GUILIELMI HARVEII,
Angli, medici Regii, & in Londinensi medicorum collegio professoris anatomiæ,
DE
MOTU CORDIS
& sanguinis in animalibus,
ANATOMICA
EXERCITATIO.
Cum refutationibus
ÆMYLII PARISANI,
Romani, philosophi, ac medici Veneti;
ET
IACOBI PRIMIROSII,
in Londinensi collegio doctoris medici.

LUGDUNI BATAVORUM,
Ex officina IOANNIS MAIRE.
cIↃ IↃ c XXXIX.

সেটা পাওয়া কেবলমাত্র শব ব্যবচ্ছেদ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থেকে। এটা কোন দার্শনিক মতবাদ সাপেক্ষ নয়। প্রকৃতির কাঠামোই এর একমাত্র ভিত্তি।" দীর্ঘ নয় বছর ধরে ধীরে ধীরে তিনি লিখেছেন এই বই। বারবার লিখেছেন আর বারবার কেটেছেন, বারবার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে গবেষণা চালিয়েছেন, আশ্বস্ত হয়েছেন। তারপর পুনরায় লিখেছেন। কিন্তু এতদিনে মাত্র ৭২ পাতার একটা চটি বই! তাও ছাপার হরফ স্পষ্ট নয়। অথচ এই "আপাত তুচ্ছ" বইটাই লন্ডন জুড়ে আলোড়ন ফেলে দিল! লন্ডন ছাড়িয়ে দেশ, দেশ ছাড়িয়ে সারাবিশ্বে উইলিয়াম হার্ভের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ল। কি এমন ছিল এই বইতে? ছিল এতদিনের সেই অজানা রহস্যের সমাধান! মানবদেহে রক্ত কোন পথে সংবাহিত হয়। হার্ভে বললেন হৃদপিণ্ড একটি ফাঁপা মাংসপেশি যা রক্তকে পাম্প করে। হৃদপিণ্ড যখন প্রসারিত হয় তখন রক্ত শিরা দিয়ে হৃৎপিন্ডে প্রবেশ করে আর যখন সংকুচিত হয় তখন রক্ত ধমনী দিয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এটা একধরনের চক্রাকার পথ, যা অবিরত ক্লান্তিহীনভাবে ঘটে চলেছে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৬০ থেকে ৯০ বার পাম্প করে এবং প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৩০০ লিটারের মত রক্তকে সারাদেহ ঘোরাতে পারে। হৃদপিণ্ড ও শিরার মধ্যে থাকা কপাটিকা রক্তপ্রবাহকে সবসময় একমুখী রাখে।

এতদিন পর্যন্ত গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের মতবাদকেই সবাই বেদবাক্য মনে করতো। গ্যালেনের কথা ছিল রক্তপ্রবাহ দ্বিমুখী আর রক্ত বিনষ্ট হয় প্রতিমুহূর্তে। আবার খাবার থেকেই নতুন রক্তের উৎপত্তি হয় সাথে সাথে। হার্ভে বললেন রক্ত এইভাবে বিনষ্ট হয় না, আর এত দ্রুত রক্ত তৈরি হওয়াটাও অসম্ভব। দেড় হাজার বছর! সময়টাতো কম নয়! এতদিন ধরে গ্যালেনের কথা ধ্রুব সত্য বলে মেনে এসেছে দুনিয়া। আজকের ছোকরা হার্ভে নতুন কথা বললে লোকে তা মেনে নেবে কেন? সকলে ভাবলো হার্ভে পাগল হয়ে গেছেন। তাই উল্টোপাল্টা বকছেন। অতএব তার মতো ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা বিপদজনক! এরফলে দ্রুত হার্ভের পসার কমতে থাকলো। অসহায় হার্ভে আবেদন করলেন সকলের কাছে, "আমার কথা চোখ বুজে বিশ্বাস করতে হবে না, নিজেরা পরীক্ষা করে দেখুন, আমাকে বারবার প্রশ্ন করুন। কোন কিছুকে বিচার না করে চিরকাল সত্য বলে মেনে নেবেন না।" কিন্তু কেউ পাত্তা দিলো না হার্ভেকে। এই সময়কালের মধ্যে ইংল্যান্ড অশান্ত হয়ে ওঠে। রাজদ্রোহ দেখা দেয়। রাজার কাছের লোক মনে করে বিদ্রোহীরা হার্ভের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিলো। গবেষণার দুর্মূল্য নথি নষ্ট করে দিলো। হতাশ আর আতঙ্কিত হার্ভে প্রাণ বাঁচাতে লন্ডন ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। অসন্তুষ্ট হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন আর কখনো পা রাখবেন না লন্ডনে। অনেক পরে যখন সকলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো, পুনরাবিষ্কার করলো হার্ভের কৃতিত্বকে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে! ঐতিহ্যবাহী "রয়েল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস" এর সভাপতি হবার মতো গৌরবজনক সম্মান গ্রহণ করতে বারংবার অনুরোধ গেল হার্ভের কাছে। হার্ভে ফিরিয়ে দিলেন সেই অনুরোধ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম যুগান্তকারী পথপ্রদর্শক উইলিয়াম হার্ভের শেষ জীবন কেটেছে হতাশা ও মূল্যহীন ভাবে। ১৬৫৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি, যার আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শরীরবিদ্যার নব নব দিকচিহ্ন উন্মোচিত হয়েছে।।

লেখক সহশিক্ষক (দমদম কিশোর ভারতী হাইস্কুল, উঃমাঃ) ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
email:mravishek07@gmail.com • M. 9830640660

পরিবেশ মেলা ২০২২

চন্দননগর, সবুজের অভিযান ও পরিবেশ একাদেমির উদ্যোগে ৪ দিন ব্যাপী ২২ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পরিবেশ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়। এই মেলায় জেলার বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের বন্ধুরা অংশগ্রহণ করেন। 'পরিবেশ অপরাধ'-সহ আরও ৫টি বই এই মেলায় প্রকাশ করা হয়। 'বিজ্ঞান অন্বেষক' পত্রিকার একটি স্টল দেওয়া হয়।

রিপোর্ট

অজয় মজুমদার

মেছোবিড়ালকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা

দীর্ঘদিন ধরে বাঘরোল বা ফিসিং ক্যাট নিয়ে যারা গবেষণা করছেন গ্রীন ওয়েভ তাদের মধ্যে অন্যতম। গ্রীন ওয়েভ-এর কর্ণধার টুকাই বিশ্বাস-এর কাছে জানলাম মেছোবিড়ালকে গ্রামবাসীরা বাঘের বাচ্চা মনে করে মেরে ফেলছে। আবার মাছ চাষিরা মারছে ভেড়ির মাছ খেয়ে ফেলছে বলে। মিটিংয়ে ঠিক হল ওই গ্রামে গিয়ে আমরা মানুষকে বোঝাব পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মেছোবিড়ালকে রাজ্য প্রাণীর স্বীকৃতি দিয়েছেন। ২০১০ সালে মেছোবিড়ালকে সচেতনতার আওতায় আনা হয়। ২০১৬ সালে রেড লিস্ট-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

মাছ চাষিরা সন্ধ্যা থেকে মেছোবিড়াল পাহারা দেয়। আসলেই মারার জন্য যাবতীয় ষড়যন্ত্র প্রস্তুত থাকে। এইভাবে বাগদা ব্লকের পদ্মপুকুর গ্রামে মেছোবিড়াল নিধনযজ্ঞ চলছে।

প্রাণীজগতে অবস্থান

প্রাণীজগৎ বা কিংডম—অ্যানিমালিয়া। পর্ব বা ফাইলাম—কর্ডাটা। শ্রেণি—ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী বর্গ বা অর্ডার—কার্নিভোরা বা মাংসাশী। উপবর্গ বা সাব অর্ডার—ফিলিফর্মিয়া। পরিবার বা ফ্যামিলি—ফিলিডি। গন বা জেনান—প্রিয়নেইলিউরাস। প্রজাতি বা স্পিসিস—ভেবিরিনাস।

এরা জলাভূমির কাছাকাছি স্থানে বসবাস করে। পদ্মপুকুর গ্রামে এরকম জঙ্গল নেই। এখন প্রশ্ন হল তাহলে বাগরোল প্রাণীটি কোথায় থাকছে? আর এতো দুই-একটি নয় সংখ্যায় অনেক। রাতের পর রাত গ্রীন ওয়েভের টুকাই সহ অন্যান্য সদস্যরা কালভার্টের মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে বসে বাঘরোলের গতিপ্রকৃতির ছবি তুলতে সমর্থ হয়।

অবশেষে আবিষ্কার হয় পদ্মপুকুরের ভেড়িগুলি বাংলাদেশের কাঁটাতারের বেড়ার খুবই কাছে। কাঁটাতারের ওপারে প্রচুর পরিত্যক্ত কাঁচা কবরখানা রয়েছে। অনেকদিন হয়ে গেলে কবরের মাটি ধ্বস নামে আর তৈরি হয় গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে বাঘরোল প্রবেশ করে কবরের মধ্যেই। এবং এরা এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে ফেলে। আর এখান থেকেই সন্ধ্যার পর থেকে পদ্মপুকুরের ভেড়িগুলিতে বাঘরোল খাবার সংগ্রহ করতে যায়।

প্রথমে মাছ চাষিদের বাঘরোলকে না মারার জন্য আবেদন ও সচেতনতা বাড়াবার শিক্ষা দেওয়া হয়। কথা দেওয়া হয় পুকুরে মাছ ছেড়ে দেওয়া হবে গ্রীন ওয়েভের খরচে। এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত, এইজন্যে মৌলভীদের সচেতন করে তোলা হয়েছিল এবার মৌলভীরা নামাজ পড়ার পর মহিলা ও পুরুষদের সচেতন করে তুলবেন বাঘরোল বিষয়ে। এছাড়া সদস্যরা স্কুলে স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের এবং ছাত্রদের নিকট সচেতনতা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। শিক্ষকেরা উদ্যোগী হবেন এমন ভাবেই বিষয়টি তৈরি করা হয়। এলাকায় বিএসএফদের টহলদারি থাকে বর্ডার এলাকা হবার জন্য। বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্টের পারমিশন নিয়ে এবং তাদেরকে এই কাজের আওতায় আনার কাজ শুরু হয়। এক সময় তারাও এই কাজে উৎসাহী হয়ে পড়েন। এবং সদস্যদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

বাঘরোল-এর অঙ্গসংস্থানিক গঠন ঃ দেখতে বনবিড়ালের মত। বাঘের চামড়ার মত ডোরাকাটা দাগ দেখা যায়। চামড়ার এই দাগই বাঘের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এরা বেশ শক্ত সমর্থ। ভারী দেহ সেইসঙ্গে খাটো পা থাকে। সেজন্য চট করে বিড়াল থেকে এদের পৃথক করা যায়। বাঘরোল-এর দৈর্ঘ্য ৫৭ থেকে ৭৮ সেন্টিমিটার। ওজন ৫ থেকে ১৬ কেজি। লিপ্তপদ যুক্ত। মুখটি ছোট। দুটি খাড়া কান মাথার উপরে বিন্যস্ত থাকে। মুখের মধ্যে দাঁত থাকে যা খুবই সূচালো বা ধারালো। চোখগুলি বড়।

এদের প্রজননকাল হল জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি। ৬০ থেকে ৭০ দিন গর্ভধারণকাল। শাবকদের ওজন ১৫০ গ্রাম মত হয়। জন্মের সময় তারা অন্ধ থাকে। দু সপ্তাহ বাদেই তাদের চোখগুলি ফুটে যায়। ন-মাস বয়স থেকেই তারা যৌনজীবন লাভ করে।

উলুবেড়িয়া ২ ব্লকে কলকাতার ঝালাপালা নাট্যগোষ্ঠীর বন্যপ্রাণী সচেতন মূলক একটি পথনাটিকা অভিনীত হয়েছিল। বন্যপ্রাণী দপ্তরের হাওড়া-হুগলি বনবিভাগ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন 'দ্যা ফিশিং ক্যাট প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে শামিল হয়েছে রাজ্যের দুই বন্যপ্রাণী সংগঠন

'হিউম্যান এন্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লিগ' (হিল) ও হাওড়া জেলার যৌথ পরিবেশ মঞ্চ।

মেছোবিড়ালের সন্ধান পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার পাঁচলা, ডোমজুর, হুগলির ডানকুনিতে সন্ধান পাওয়া যায়। তবে মেছোবিড়ালের সংখ্যা সম্পর্কে এখনই সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে রাজ্যজুড়ে মেছোবিড়াল-এর ওপর সমীক্ষা চলছে, তা থেকে উঠে এসেছে একটা পজিটিভ পিকচার। সুন্দরবন ও হিমালয়ের পাদদেশে এদের সন্ধান মিলেছিল। তবে রাজ্যের অন্যত্র কোথাও মেছোবিড়ালের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল বলে কোন ধারণা নেই। পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে রাজ্যপশু মেছোবিড়ালের খোঁজ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি-র অধ্যাপক গৌতম সাহা বলেন পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল, নন্দকুমার সহ চারটি এলাকায় সবচেয়ে বেশি মেছোবিড়ালের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমীক্ষা কাজটি করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন এই প্রাণীটি বেশ বিপদের মধ্যেই আছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিউজ প্রোগ্রামের ডিরেক্টর অজন্তা দে-র মতে নীলগঞ্জের বাসিন্দাদের একাংশ বলেন দেড় বছরে ১৬টি মেছোবিড়াল তারা মেরে ফেলেছেন।

উত্তর ২৪ পরগণা, বনগাঁ মহকুমার, বাগদা ব্লকের, পদ্মপুকুর এলাকায় প্রচুর মেছোবিড়াল হত্যালীলা চলছিল। এ খবর পেয়ে, গ্রীন ওয়েভ থেকে উদ্যোগ নেয় পোস্টমর্টেম করার। পারমাদন বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্যের নেতৃত্বে ব্লকের সরকারি পশু চিকিৎসক দিয়ে পোস্টমর্টেম করা হয়। যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে তা হল ঘাস মারা বিষ ও কীটনাশক খাইয়ে মেছোবিড়ালদের হত্যা করা হয়েছিল। মেছোবিড়ালের সঙ্গে অনেক শিয়ালও মারা যায়। বর্তমানে শিয়ালও এটি বিপন্ন প্রাণী। বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ সিনাজেনেটা, ক্যালরিস এক্সট্রা ২৭.৫ এসি, পাইরেজেসোলফুরন ইথাইল জাতীয় বিষ খাইয়ে প্রাণীগুলিকে হত্যা করা হচ্ছিল।

গ্রীন ওয়েভের উৎকর্ষতা এই যে যারা একদিন মেছোবিড়ালকে শত্রু মনে করত এবং বিষ খাইয়ে মেরে ফেলত, তারাই আজ শিশুদের মধ্যে এবং মাছ চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে চলেছে, কেন মেছোবিড়ালকে হত্যা করা যাবে না। সীমান্তবর্তী বাহিনীকে নিয়ে গ্রামের মানুষ সামাজিক কাজে ব্রতী হয়েছে। আশা করা যায় আগামীদিনে মেছোবিড়াল-এর সংখ্যা আরো বাড়বে। বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত হবে। আরো অনেক মানুষ এই কাজে এগিয়ে আসবে। বন্যপ্রাণীকে হত্যা করার আগে অনেকবার ভাববে। এই সচেতনতা এই গ্রামে তৈরি হয়েছে।

লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: majumderajay@gmail.com • M. 8918824281

শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেস

কোচবিহার উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী মুন দাস শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেসের রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পর জাতীয় স্তরে সুযোগ পেয়েছে নিজেদের প্রকল্প উপস্থাপন করার। এই প্রকল্প উপস্থাপনা দলের অন্য সদস্য ছিল মুনের সহপাঠী—নিকিতা গোস্বামী এবং পথপ্রদর্শনকারী শিক্ষিকা ছিলেন দীপ্তা পাল। এই প্রকল্প নির্মাণে শ্রী তপন দাস মহাশয়ের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। প্রকল্পের বিষয় হল নিজের বিদ্যালয় এবং পার্শ্ববর্তী রাজআমলে নির্মিত রানিবাগানের জীববৈচিত্র্যের অন্যতম সজীব উপাদান গাছ যে পরিবেশের উষ্ণতা কমাতে এবং আর্দ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে তা প্রমাণ করার জন্য যথাক্রমে হিক্সের থার্মোমিটার এবং হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় এবং রানিবাগানে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। এই পরিসংখ্যান থেকে যে গড় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পাওয়া যায় তার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, যেখানে গাছের সংখ্যা বেশি (উল্লেখ্য রানিবাগান) সেখানে পরিবেশের উষ্ণতা কম ও আর্দ্রতা বেশি। এর সাথে দুই জায়গার কীটপতঙ্গ, প্রাণী (যেমন ব্যাঙ, পাখি) প্রকৃতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে দেখা যায় যে রানিবাগানে এদের সংখ্যা বিদ্যালয়ের থেকে অনেক বেশি অর্থাৎ গাছ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এই বিশ্বউষ্ণায়নের ফলস্বরূপ মেরুপ্রদেশের বরফের গলন প্রতিরোধে, খরা ও অতিবৃষ্টির প্রকোপ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আমাদের সকলকে বৃক্ষরোপণে উদ্যোগী হতে হবে।

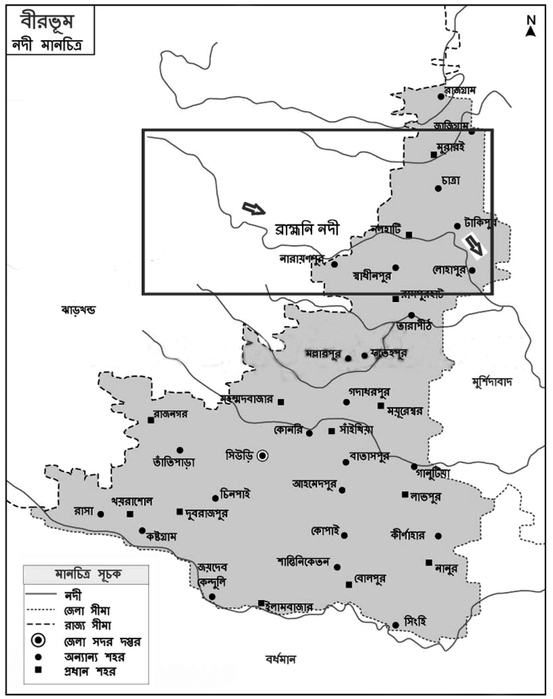

ড. উৎপল অধিকারী, ড. সুনাম চ্যাটার্জী

ইতিহাসের নীরব সাক্ষী বীরভূমের ব্রাহ্মণী নদী

দূষণে আক্রান্ত ব্রাহ্মণী নদী ● ছবি : উৎপল অধিকারী

নির্বাক নদী নিঃশব্দে ইতিহাসের বহু ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকে। বীরভূমের অতি প্রাচীন এক নদী ব্রাহ্মণী এমনই এক ইতিহাস খ্যাত নদী। এই নদীর বুক বেয়ে বীরভূমের দাপুটে এক মহারাজা নন্দকুমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে, ভারতের পুণ্যভূমি, অতি প্রাচীন নগরী কাশী থেকে কষ্টিপাথরের তৈরী এক কালী মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন। কথিত আছে, মূর্তিটি অতি সুপ্রাচীন এবং মগধের মহারাজা জরাসন্ধের গৃহদেবী ছিলেন। পরে অবশ্য বেনারসের মহারাজ চৈত্যসিংহ তাঁর গৃহে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজা করেছিলেন। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। সেই দেবীকে নিয়ে মহারাজ নন্দকুমার তাঁর নিজবাটী আকালিপুরে গুহ্যকালী রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। এখনো এই ব্রাহ্মণী নদীর তীরে গুহ্যকালী এবং তাঁর মন্দির ভক্ত সাধারণের কাছে এক অতি পবিত্র স্থান। বীরভূমের ভদ্রপুরের কাছে এই নদীর তীরে ইংরেজদের একটি পুরানো রেশমকুঠি আছে।

গঙ্গার ডান তীরের উপনদী ব্রাহ্মণী নদীর অপর নাম হল কালিন্দী। ঝাড়খণ্ডের দুধুয়া পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে নদীটি নারায়ণপুরের কাছে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় প্রবেশ করেছে। নদীটি ভদ্রপুর, রানীনগর, মকরমপুর, কেলাই, গোপগ্রাম, কানুপুর, বালশা, মধুপুর, মোতায়েন, জয়চন্দ্রপুর, জয়পুর, কৃত্তিপুর, নলহাটি, রামপুরহাট ও মালদার বামনগোলা ব্লকের নালাগোলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীটি প্রবাহিত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদীর প্রধান উপনদীগুলি হল ত্রিপিতা ও গামারি ইত্যাদি। বীরভূমের উত্তর সীমান্তে জন্ম হওয়া গামারি নদীটি মুর্শিদাবাদে ব্রাহ্মণী নদীতে পতিত হয়েছে। মনিগ্রামের কাছ থেকে ব্রাহ্মণী নদীর একটি পুরানো সেঁচখাল, যা ব্রাহ্মণী নর্থ ক্যানাল নামে পরিচিত। এই খালটি বীরভূম জেলার নলহাটি, সিউড়ি, চিনপাই, ইলামবাজার, বোলপুর, নানুর, কালিগঞ্জ ইত্যাদি পর্যন্ত প্রসারিত।

নদীর বুকে তৈরি করা হয়েছে বৈধরা জলাধার, যে জলের মাধ্যমে বীরভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রুখা-সুখা জমিতে জল সরবরাহ করা হয়। স্থানটি বর্তমানে একটি পিকনিক স্পট হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এছাড়াও নদীটির বুকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। বীরভূমের রানীগঞ্জ-মোরগ্রাম ৬০নং জাতীয় সড়কের উপর নলহাটির কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু আছে, যা ওই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এছাড়াও নলহাটি ব্লকের বাবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভদ্রপুরের কাছে একটি নদী বাঁধ তৈরি হয়েছে। মালদার বামনগোলা ব্লকের নালাগোলার কাছে জিতু সেতু হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু।

নলহাটির দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত একটি মনোরম মন্দির হল 'মহানির্বাণ মঠ'। এই ব্রাহ্মণী নদীর পাশে প্রায় দেড় একর জায়গা জুড়ে রয়েছে মন্দিরটি। স্থানটি গাছপালা, ফুল ও ফলের গাছে পরিপূর্ণ। শান্ত নদীর তীরে অবস্থিত স্থানটি স্বর্গসম এবং সর্ব ধর্মের মানুষের মিলনক্ষেত্র এটি।

নানান আনন্দ, উৎসব ও বিভিন্ন প্রাচীন মেলার সাক্ষী এই ব্রাহ্মণী নদী। আকালীপুরের গুহ্যকালীর মূল মেলা বসে পৌষ সংক্রান্তিতে। পুণ্যার্থীরা এই নদীতে স্নান করে মা কালীর পুজো দেয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ এই উৎসবে শামিল হন। অত্যন্ত প্রাচীন বাংলায় এটি। স্থানটি পিকনিক স্পট হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেছে।

সমস্ত নদীর মতোই ব্রাহ্মণী নদীর বর্তমান অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নদীটি থেকে ব্যাপকহারে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক মোটরচালিত যন্ত্রের মাধ্যমে নদীর গর্ভ থেকে বালি তোলা হচ্ছে। এর ফলে নদীর গর্ভে ৫০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত বিশাল গর্ত তৈরি করা হচ্ছে। নদীর পাড়ের খুব কাছ থেকে বালি তোলা হচ্ছে এবং বৈধরা জলাধারের ১০০ মিটারের মধ্যে বালি তোলা হচ্ছে। যা এই জলাধার এবং তৎসংলগ্ন বাঁধের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। নদীর পাড় বারবার ভেঙে যাচ্ছে, ফলে বন্যার সময় নদীসংলগ্ন গ্রামগুলি বন্যার কবলে পড়ছে। নদীর প্রাণীরা মারা যাচ্ছে এবং জীববৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে। নদীর তীরে অবস্থিত জয়পুর ও কীর্তিপুর গ্রাম সংলগ্ন অঞ্চলে পাড় কেটে, নদীতে ট্রাক্টর বা লরি নামিয়ে ব্যাপকভাবে বালি তোলা হচ্ছে।

নিজের সভ্যতা, নিজের জনপদকে বাঁচাতে হলে নদীকে বাঁচাতেই হবে। সরকারকে আরো বেশি বেশি নজর দেওয়া দরকার এইসব রাঢ়বঙ্গের ছোট ছোট নদীর উপর। কারণ নাম-না-জানা বা অজানা এই নদীগুলি কেবলমাত্র চাষবাসের জন্য নয়, বিপুল জীববৈচিত্রকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই প্রশাসনের সাথে সাধারণ মানুষকে আরও সক্রিয় হতে হবে, নিজের বাড়ির পাশের নদীটিকে। মানুষ জাগলে মজে যাওয়া অর্ধমৃত এই নদীগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠবে। সেই শুভদিনে গ্রামের অন্ত্যজ ও প্রান্তজ মানুষগুলি আবার নদীর স্বচ্ছ জলে স্নান করে, গামছা দিয়ে বেশ কিছু চুনোমাছ ধরে নিয়ে যাবে, মাছ ভেজে ভাত খাওয়ার জন্য।

ড. উৎপল অধিকারী, ড. সুনাম চ্যাটার্জী

রবি ঠাকুরের ছোটনদী কোপাই

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নদী কোপাই বা কোপবতী। প্রায় নাম-গোত্রহীন এই নদী কবির কলমে বিখ্যাত হয়ে আছে। কখনো তিনি লিখছেন-'এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী'। কখনো বা সহজ পাঠের সেই বিখ্যাত কবিতা :

'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।'

ছবি : অনুপ হালদার

বোলপুরের লালমাটির বুক চিরে যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে এই ছোট্ট জলধারা। আঞ্চলিক ভাষায় শাল নদী হলেও কোপাই নামেই এটি সমধিক পরিচিত। বর্ষায় এই অঞ্চলে নদীটির কুপিত রোষ দৃষ্টি পড়তো বলে, এর আরেক নাম কোপবতী হতে পারে। শীত ও গ্রীষ্মে শান্ত-নিরীহ এই নদী বর্ষায় রুদ্র মূর্তি ধারণ করে। বীরভূম জেলার উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত বক্রেশ্বর এবং দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত অজয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে কুলকুল ধারায় বয়ে চলেছে কোপাই। উৎস থেকে প্রথমাংশে নদীর নাম-শাল, বোলপুরে বিনুরিয়া গ্রামের কাছ থেকে এই নদীর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে কোপাই এবং লাভপুর থেকে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর পর্যন্ত নাম কুঁয়ে নদী। এই ভরতপুরেই অবশ্য কুঁয়ে নদী, ময়ূরাক্ষীর সাথে মিলিত হয়েছে।

ঝাড়খন্ডে জামতারা জেলার খাজুরী নামক এক গ্রাম থেকে উৎপন্ন হয়ে নদীটি দুবরাজপুর, খয়রাশোল, লাভপুর ও ইলামবাজার থানার প্রায় ২৩০টি গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লাভপুর থেকে তিন কিমি দক্ষিণে পাথরঘাটা গ্রামের কাছে বক্রেশ্বর এবং কোপাই নদী মিলিত হয়ে, কোইয়া বা কুঁয়ে নদী নাম নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার দিকে চলে গেছে এবং শেষ অবধি ময়ূরাক্ষী নদীতে মিলিত হয়েছে। এই সম্মিলিত জলাধারাটি ২৩^{0}৩৭ মিনিট উত্তর থেকে ২৩^{0}৫৭ মিনিট উত্তর এবং ৮৭^{0}১৬ মিনিট পূর্ব থেকে ৮৮^{0}১৬ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত প্রসারিত এবং সমগ্র নদী অববাহিকাটি উর্বর মৃত্তিকার জন্য চাষবাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত। কোপাই নদী উপত্যকা বরাবর সর্বোচ্চ উষ্ণতা পরিমাপ করা হয়েছে ৩৫ থেকে ৪০ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা ১২ থেকে ১৭। এখানকার সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হল ১২০০-১৭০০ মিমি। এই নদী অববাহিকার মোট আয়তন ৪৩৬ বর্গ কিমি এবং অববাহিকার নিম্নাংশ বন্যাপ্রবণ।

বীরভূমের একটি বৃহৎ অংশের মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হল এই কোপাই। নদীটি এমনই প্রাচীন, এই নদী উপত্যকায় সুপ্রাচীন মাইক্রোলিথ স্ফটিক পাথর ও প্রস্তরীভূত কাঠ পাওয়া গেছে। ভূমির ক্ষয় কার্যের ফলে বোলপুর এবং তার পার্শবর্তী অঞ্চলে খোয়াই দেখা যায়। এই খোয়াই এই অঞ্চলের সৌন্দর্যকে ভিন্ন মাত্রা দেয়। অসংখ্য গবেষক, পর্যটক এবং সাধারণ মানুষ এটা দেখতে আসেন। কোপাই নদীর তীরে অবস্থিত দুবরাজপুর শহর। এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে গ্র্যানিট পাথর এবং এখানে দুটি বড় পাথর একে অপরকে জড়িয়ে ধরে অদ্ভুত ভাবে অবস্থান করছে বহুকাল ধরে। এটি স্থানীয় মানুষদের কাছে মামা-ভাগ্নে পাহাড় নামে পরিচিত। কোপাই নদীর ধারে অবস্থিত দুটি সাংস্কৃতিক পীঠস্থান হল বোলপুর-শান্তিনিকেতন ও লাভপুর। বোলপুর-শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসপুত্রের ন্যায়। এখানে অবস্থিত বিশ্বভারতী, সমগ্র পৃথিবীতে জ্ঞানের আলো বিকিরণ করে চলেছে। লাভপুরে জন্ম হয় বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কোপাই এর পাড়ে দুটি তীর্থস্থান বর্তমান; একটি কঙ্কালীতলা- যেটা বোলপুর থেকে প্রায় আট-নয় কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত, অন্যটি লাভপুরের ফুল্লরার মন্দির। সুপ্রাচীন এই দুই মন্দির ভক্ত হৃদয়ে ভিন্নভাবে অবস্থান করছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন নদীতে 'কলকল স্ফটিক স্বচ্ছ স্রোত'। নদীর পাড়ে তিনি দেখেছিলেন 'শণের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে/ জেগে উঠেছে কচি কচি ধানের চারা/ অদূরে তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে'। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে নদী তার স্বাভাবিক নাব্যতা হারিয়েছে। নদী হয়েছে জরাগ্রস্ত। সারা বছর নদীতে জল পাওয়া যায় না। অথচ বর্ষায় নদী ভরে ওঠে কর্দমাক্ত ঘোলা জলে। বিভিন্ন স্থানে নদীর বুকে জেগে উঠছে বালির চর। সাধারণ গ্রামের মানুষ সারা বছর হেঁটেই নদী পার হয়ে থাকে। বর্ষায় চলে ছোট ডিঙ্গি অথবা সাঁতারেই পার হয় মানুষ। তবে কিছু কিছু স্থানে নদীর উপর গড়ে উঠেছে ব্যারেজ, যেমন কুলতোড় গ্রামে কোপাই নদীর উপর নির্মিত হয়েছে ব্যারেজ। নদীর তীরে গড়ে ওঠা অসংখ্য ইঁটভাটা থেকে নদীর পাড়ের ভূমিক্ষয় যেমন হচ্ছে, তেমনিই এখান থেকে নির্গত ধোঁয়া থেকে ব্যাপকহারে বায়ুদূষণও হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে বালিখাত। নদীর বুক থেকে বেআইনিভাবে তুলে নেওয়া হচ্ছে বালি। ফলে নদীকে প্রতিনিয়ত রিক্ত-নিঃস্ব করে দিচ্ছে এখানকারই মানুষেরা। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে কোপাই নদীর ওপর গবেষণা করছেন বিশ্বভারতীর নদী বিশেষজ্ঞ মলয় মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর গবেষকবৃন্দরা। তাঁদের গবেষণাতে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তিনি বলছেন নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের নদীর প্রতি আর আত্মীয়তা এবং মমত্ববোধ

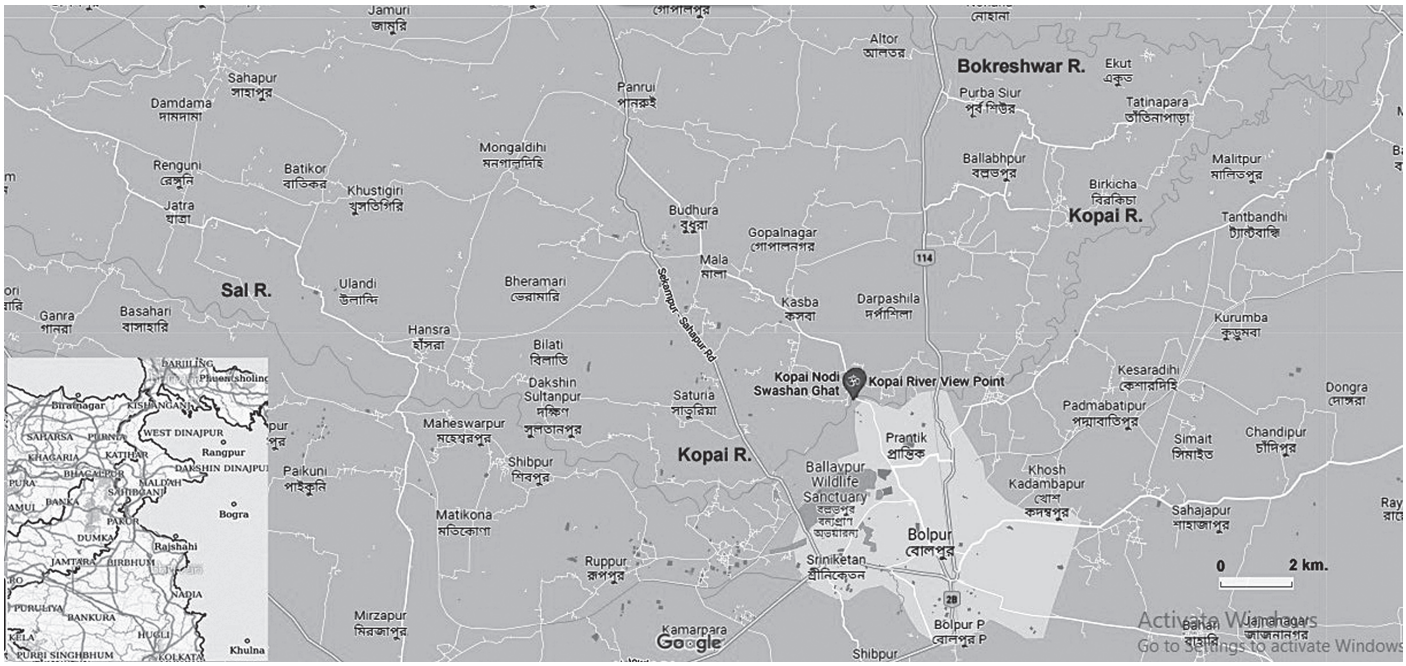

মানচিত্র : কোপাই নদী

নেই। তাদের প্রতিনিয়ত উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার শিকার এই নদীটি। অথচ দীর্ঘদিন ধরে, এখানকার মানুষ এই নদীর জল পরিশুদ্ধ করে পানীয় হিসেবে ব্যবহার করত এবং চাষের কাজে নদীর জল অবশ্য এখনও তারা ব্যবহার করে। ছোট্ট এই নদীটিকে ঘিরে স্পন্দিত হয় বীরভূমের ছোট ছোট এই গ্রামগুলির জীবন। তাকে ঘিরে নানা উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। নদীর তীরগুলিতে অবস্থিত অসংখ্য বৃক্ষ, তৃণ ও লতাগুল্ম এবং তাতে স্পন্দিত হয় বিপুল জীববৈচিত্র। অথচ দিনের-পর-দিন নদীর স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে নদীখাত, জেলার মানচিত্র থেকে কোপাই নদী মুছে যেতে বসেছে, মজে যাচ্ছে অধিকাংশ অংশ। এই ব্যাপারে ধ্যান নেই বেশিরভাগ নাগরিকেরই। অথচ দিনের পর দিন তারা নির্বিচারে অত্যাচার চালাচ্ছে নদীর উপর। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কেবলমাত্র বীরভূম জেলাতে কম বেশি আঠাশটি ইটভাটা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলের এবং শহরের ময়লা, বর্জ্য পদার্থকে প্রত্যক্ষভাবে নদীর জলে ফেলা হচ্ছে। ফলে নদীর জীববৈচিত্র যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনিই নদীর ছোট ছোট প্রাণী, গ্রামের মানুষের অতি প্রিয় চুনো মাছ ইত্যাদি আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

অথচ একটু সতর্ক হলেই নদীকে বাঁচানো যায়। কেবল বর্ষার আগে নয়, সারা বছর ধরে নদীর বিভিন্ন জায়গায় বাঁধকে মেরামত করতে হবে, নদীগর্ভের বালিকে খনন করে নদীকে সুগভীর করতে হবে, বীরভূমের পর্যটন শিল্পের সঙ্গে কোপাইকে যুক্ত করতে হবে। বনসৃজন, খন্ডঅরণ্য সৃষ্টির মাধ্যমে প্রচুর গাছপালা লাগাতে হবে। যাতে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নদী এবং সবুজের আকর্ষণে আবার কোপাই এ ফিরে আসে এবং সময়ের সাথে সাথে নদী যেন তার পূর্বরূপ ফিরে পায়। সকলকে মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর বুকে এই নদী-খাল-বিল যেন তার শিরা উপশিরার ন্যায়। আমাদের শরীরের শিরা উপশিরা নষ্ট হলে যেমন আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে, ঠিক তেমনই নদী, খানা-খন্দ বুজে গেলে ধরিত্রী মাতা নিস্তেজ হয়ে পড়বে।

তথ্যসূত্র :

১। বাংলার নদনদী, দিলীপকুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশকাল-২০০৭; প্রকাশক-দে'জ পাবলিশিং

২। আনন্দবাজার পত্রিকা-১০.০১.২০১৫

৩। Wikipedia

৪। উইকিপিডিয়া

৫। Malley– L.Ss– ICS– Birbhum– Bengali District Gazetteers. P.5–1995 reprint– Govt. Of West Bengal

৬। Poverty and Vulnerability. Vulnerability due to flood. Human development report-Birbhum archived from the original on 7 August–2010.

লেখক ড. উৎপল অধিকারী, আঝাপুর হাইস্কুল (জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান)

M. 9153123343

লেখক ড. সুনাম চ্যাটার্জী, সাঁচড়া হাইস্কুল (জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান)

M. 9474376310

বরুণ কুমার দত্ত

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ—এক ঝলকে

নিউটনের তত্ত্বে মহাকর্ষ দুটি বস্তুর মধ্যে অদৃশ্য আকর্ষণ বল বা টানাটানির ব্যাপার। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে আইনস্টাইন দেখালেন, মহাকর্ষ কোন টানাটানি নয়, এটি বস্তুর উপস্থিতির জন্য শূন্য স্থানের এক বিচিত্র জ্যামিতির খেলা। বলাবাহুল্য ভারী বস্তু নাড়াচাড়া করলে পাশের শূন্যস্থানে এক ধরনের কাঁপন সৃষ্টি হয়। এটাই ঢেউ বা মহাকর্ষ তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। নিউটনের তত্ত্বে মহাকর্ষ তরঙ্গের কোন ব্যাপার নেই—এটা সাধারণ অপেক্ষবাদের এক আশ্চর্য তাৎপর্য, যা সত্যিই বিস্ময়কর।

সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ব্যাপারটি ছিল। কিন্তু আইনস্টাইন প্রথমে সেটি মানতে চাননি। যাইহোক এই তত্ত্ব অনুযায়ী অতি প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্রের ফলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। সুবিশাল ভরের কোন বস্তুর (Massive object) যেমন কৃষ্ণগহ্বর বা নিউট্রন নক্ষত্রের ভরের বা অবস্থানের পরিবর্তন হলে ঐ বস্তুটির চারপাশের শূন্যস্থানে যে আলোড়ন বা ঢেউ সৃষ্টি হয়, সেটাই তরঙ্গের আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। তরঙ্গের প্রকৃতি নির্ভর করে ঐ বস্তুটির ভরের ওপরে। একটি সুন্দর উদাহরণ দেওয়া যায়। ধরা যাক একটি বড় ড্রামে পরিষ্কার জল ভর্তি রয়েছে। ঐ ড্রামটির নীচে দুটি ভারী লোহার বল কাছাকাছি রাখা হয়েছে। এখন হঠাৎ যদি বলদুটি একে অন্যের সাথে ধাক্কা দেয় তখন ঐ ধাক্কার অভিঘাত জলের মধ্যে তরঙ্গ বা ঢেউ সৃষ্টি করবে এবং ওপর থেকে সেটি বেশ বোঝা যাবে। ঠিক এইভাবেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, যা আমরা এবার ব্যাখ্যা করব।

বস্তুজগতে আমরা দুটি সত্তার (Entity) উপস্থিতি লক্ষ করে থাকি। পদার্থ বা বস্তু (Matter), যার ভর আছে কিন্তু কাজ করার ক্ষমতা নেই আর দ্বিতীয়টি হল, শক্তি (Energy), যার কাজ করার ক্ষমতা আছে কিন্তু ভর নেই। ভর ও শক্তির সমন্বয়ে বাস্তব জগতের সমস্ত কর্মকান্ড সংঘটিত হয়। ভর ও শক্তি যেন একই মুদ্রার দুই দিক। এবং ঐ একই ভাবে দেশ-কালও যেন মহাবিশ্বের একটা চাদরের (Febric) মত রয়েছে। যেকোন ভারী বস্তু (বা শক্তির) উপস্থিতি ঐ চাদরটিকে দুমড়ে মুচড়ে (Warped) দিয়ে একটা তরঙ্গের আকারে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই তরঙ্গের বেগ আলোর বেগের সমান। উদাহরণ হল, সমুদ্রে যখন জাহাজ চলতে থাকে তখন জলের ওপর ঢেউ বা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। অতি ভর বিশিষ্ট কোন বস্তু যখন দ্রুতবেগে গতিশীল হয়, তখন ঐ বস্তুর চারপাশের শূন্যস্থানটি ভীষণভাবে বিকৃত (Distortion) হয় এবং সেখান থেকেই তরঙ্গাকারে মহাকর্ষের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু ভর ও শক্তি সমতুল্য সেইজন্য অতি বৃহৎ শক্তিক্ষেত্রও এই তরঙ্গ তৈরি করতে পারে। তরঙ্গের প্রবাহের জন্য শূন্যস্থান ছোট বা বড় হয়। মহাকর্ষ তরঙ্গের শক্তি নির্ভর করে ঐ বস্তুর ভরের ওপর আবার বস্তুটি বেশি দ্রুতগামী হলে নির্দিষ্ট সময়ে বেশি তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। দুটি বিশাল কৃষ্ণগহ্বরের পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং তাদের মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার ফলে যে মহাকর্ষ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেটি যন্ত্রের সাহায্যে ধরা সম্ভব হয়েছে।

এসবই মহাকর্ষ তরঙ্গের তত্ত্বকথা, কিন্তু তাকে পরীক্ষায় ধরা যায় কিভাবে? বহুকাল ধরেই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সাফল্য আসেনি। অবশেষে ২০১৬ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন, যে এই তরঙ্গ সনাক্ত করা হয়েছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই সনাক্তকরণ করা সম্ভব হয়েছিল, তার নাম লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি বা সংক্ষেপে লাইগো (Ligo)। অতীব জটিল এই পরীক্ষার বিশদে বর্ণনা আমাদের এই প্রাথমিক আলোচনায় দেওয়ার অবকাশ নেই। শুধু এটা বলা যায় যে, প্রসারণ ও সংকোচনের অতি ক্ষুদ্র পরিমাপ করা হয়েছে লেজার (Laser) রশ্মির সাহায্যে। লাইগো যন্ত্রটিতে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের কম্পনও ধরা পড়ে যায়, কারণ যন্ত্রটি খুবই সংবেদনশীল। মনে রাখতে হবে যে মহাকর্ষ তরঙ্গ খুবই দুর্বল, সহজে যন্ত্র দিয়ে তাকে ধরা যায় না। বিশাল ভরের কোন বস্তু (যেমন কৃষ্ণগহ্বর বা নিউট্রন নক্ষত্র) যখন অতি দ্রুতগতিতে চলমান হয়, একমাত্র তখনই যন্ত্রের সাহায্যে এই তরঙ্গকে ধরা সম্ভব হয়। যদিও কাজটি খুবই কঠিন, কারণ খুব ছোট একটি সংখ্যাকে পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা। লাইগো যন্ত্রটির একটি বাহুর দৈর্ঘ্য L ধরা যাক, যদি মহাকর্ষ তরঙ্গের প্রভাবে তার সংকোচন বা প্রসারণ δL হয়, তাহলে তার আপেক্ষিক মান, $\frac{\delta L}{L} \simeq 10^{-22}$, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি সংখ্যা। স্পষ্টতই বোঝা যায় পরীক্ষাটি কতটা জটিল।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পদার্থবিজ্ঞানে বহু আলোচিত আলো, শব্দ ও রেডিও ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গের থেকে একেবারেই আলাদা রকমের। আগেই বলা হয়েছে মহাকর্ষ তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান এবং এর চরিত্রটি একেবারেই ভিন্ন। অদ্ভুত রকমের এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সাহায্যে মহাবিশ্বের অনেক অজানা রহস্যের সমাধান মিলতে পারে—এমনটাই ধারণা অনেক বিজ্ঞানীদের।

"মহাবিশ্ব সম্পর্কে সবথেকে অবোধ্য জিনিসটি হল এই যে মহাবিশ্ব আমাদের কাছে বোধ্য"—আইনস্টাইন।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email:drbkdm@gmail.com • M. 9330956004

নিলয় মন্ডল

কস্তুরী মৃগের করুণ কাহিনী

প্রসঙ্গ যখন আসে ভেষজ সুগন্ধির তখন সবার আগে মাথায় আসে চন্দনের কথা। ঠিক তেমনি এক মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য প্রাণীজ সুগন্ধি হল কস্তুরী। এই কস্তুরী এক বিশেষ প্রজাতির হরিণ থেকে পাওয়া যায়, যা 'কস্তুরী মৃগ' নামে পরিচিত। যার ইংরাজি নাম 'Musk Beer'. এরা লাজুক স্বভাবের হয় এবং বসবাসের জন্য নিরিবিলি জায়গা পছন্দ করে এবং বিচরণ করে একান্তই নির্জনে।

সমস্ত প্রজাতির হরিণ বিচরণকারী জীব, তাদের প্রধান খাদ্য গাছের পাতা। এদের পাকস্থলি ছোট হয় তাই জাবরকাটা ও হজমের সুবিধার্থে এরা আঁশযুক্ত খাদ্য না খেয়ে এবং তার পরিবর্তে কচি পাতা, নরম ঘাস, অঙ্কুরিত চারা এবং নরম গাছের ডাল খেয়ে থাকে। হরিণের শিং-এর বৃদ্ধির জন্য তাদের বেশী পরিমাণ ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার প্রয়োজন হয়ে থাকে। অন্যদিকে কিছু রিপোর্টের ফলে জানা গেছে যে কিছু হরিণ মাংসাশী হয়ে যাচ্ছে যেমন 'নর্থান বট হোয়াইট'।

উত্তরাখণ্ড, হিমাচলের নির্দিষ্ট কিছু বনাঞ্চল ছাড়াও নেপাল, ভুটান এবং চিনের পাহাড়েও এদের স্বল্প দেখা মেলে। এছাড়া পামির মালভূমির গ্রন্থি পর্বতমালায় তৃণভূমি সমৃদ্ধ উপত্যকায় এই হরিণের দেখা মেলে। হিমালয়ের কোলে ৫০০০-৮০০০ ফুট উচ্চতায় আধা বরফের ঝাউবনে ছড়িয়ে থাকা কস্তুরী মৃগের সংখ্যা এখন হাতে গোনা। এদের পা সরু, মাথা সুন্দর ও চোখ চমৎকার উজ্জ্বল। অত্যন্ত শীতল পরিবেশে বসবাসের কারণে এদের গায়ে লোমের আস্তরণ অত্যন্ত মোটা পালকের মত হয়।

কস্তুরী মৃগ-এর উপরের মাড়ি থেকে গজদন্তের মত দুটি দাঁত ছোট আকারের বের হয়, এই ধরনের দাঁত সব প্রজাতির হরিণ-এর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই দেখেই কস্তুরী মৃগকে শনাক্ত করা হয়।

এই প্রজাতির হরিণ আত্মরক্ষায় পটু। কিন্তু তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারে না কারণ এদের দেহের তীব্র গন্ধ। এই ঘ্রাণ অনুসরণ করে শিকারীরা তাদের ঠিক খুঁজে বের করে।

কস্তুরী মূলত পুরুষের পেটে অবস্থিত সুগন্ধি গ্রন্থি নিঃসৃত সুগন্ধির নাম। এই কোশ যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন এর থেকেই সুঘ্রাণ বের হতে থাকে, হরিণের ১০ বছর বয়সে সুগন্ধকোশ পূর্ণতা লাভ করে। মিলন ঋতুতে পুরুষ হরিণের পেটের কাছের এই কস্তুরী গ্রন্থি থেকে সুগন্ধ বের হয় যা মেয়ে হরিণকে আকৃষ্ট করে। আশ্চর্যজনক ও মজার ব্যাপার হল এই যে হরিণটির নাড়িতে এই কোশের জন্মের ব্যাপারে হরিণটি নিজে ওয়াকিবহাল থাকে না।

এই সুগন্ধি অত্যন্ত প্রবল যা কোন গন্ধহীন পদার্থের সঙ্গে স্বল্প পরিমাণ মেশালে সমস্ত পদার্থ সুবাসিত হয় কস্তুরীর ঘ্রাণে। তিন ভাগ গন্ধহীন পদার্থের সঙ্গে এর এক ভাগ মেশালে সমস্ত পদার্থ সুবাসিত হয় কস্তুরীর ঘ্রাণে।

কস্তুরী সংগ্রহকারী অসাধু লোকেরা এই সুগন্ধিকে প্রকৃত অবস্থায় রাখে না সচরাচর, অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করে। শুকিয়ে যাওয়া রক্তের সাথে এদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

সুগন্ধিটি আমাদের ভাল লাগলেও এর পেছনে রয়েছে বেদনাদায়ক কাহিনি। ১০ বছর বয়সে নাভির গ্রন্থি পরিপক্ক হলে এই সময় হরিণটিকে হত্যা করে নাভী থেকে তুলে নেওয়া হয় পুরো গ্রন্থটি। তারপর রোদে শুকানো হয়। একটা পূর্ণাঙ্গ কস্তুরীর ওজন প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ গ্রাম। কস্তুরী কোশের বাইরের দিকে থাকে এলোমেলো লোম। সেগুলো ছাড়িয়ে যখন শুকনো কস্তুরীটিকে জলে ফেলা হয় তখন পরিষ্কার কস্তুরী বের হয়।

সমস্ত হরিণের মধ্যে এই কস্তুরী সমপরিমাণে পাওয়া যায় না, কারো ক্ষেত্রে কম আবার কারো ক্ষেত্রে কস্তুরী উৎপন্নই হয় না। হরিণের বয়স এবং পরিবেশ ভেদে কস্তুরীর পরিমাণ এর তারতম্য হয়। দেখা গেছে এক কিলোগ্রাম কস্তুরী পাওয়ার জন্য প্রায় ২ হাজার হরিণ শিকার করতে হয়। এই কস্তুরী সংগ্রহকালে এর গন্ধ এত উগ্র থাকে যে হরিণের নাভি কাটার সময় শিকারীরা মোটা কাপড় দিয়ে নিজেদের নাক বেঁধে নেয়। অনেক সময় এই গন্ধ সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারো কারো চোখ, নাক দিয়ে জল ও মুখ দিয়ে লালা ঝরতে শুরু করে। বর্তমানেই কস্তুরী নামক প্রাণীর সুগন্ধির দাম সোনার দামের প্রায় তিনগুণ।

লেখক কেশপুর কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের স্নাতক স্তরের ছাত্র
email: niloymandal`1998@gmail.com • M. 8370822693

অমর কুমার নায়ক

ঝগড়াটে ছাতারে পাখিদের কথা

আমার বাড়ির জানালায় আয়না কাঁচগুলো লাগানোর পর থেকেই বিপত্তির সূত্রপাত। মাঝেমধ্যেই লক্ষ করতাম একদল পাখি এসে জানলার সামনে ডানা ঝাঁপটায় আর চিৎকার করে জানলার কাঁচ ঠুকে বাড়ি মাথায় তোলে। এই দলে যে একরকম পাখি থাকে তা নয়। আগে না চিনলেও এখন তাদের চিনেছি। ছাতারে, বুলবুলি আর দোয়েল পাখি আসে প্রায়ই নিয়ম করে সকালে দুপুরে আয়নায় প্রতিচ্ছবি দেখে ঝগড়া করতে। আসলে ওদের মনে হয় এই বুঝি নিজের এলাকায় অন্য কোন দল এসে জুটল। আর তাই জায়গা দখলে রাখতে এই রণং দেহি মূর্তি। মনুষ্য সমাজেই সীমাবদ্ধ নয় এই জায়গা নিয়ে লড়াই। বেশকিছু প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে এই যুদ্ধ বেশ প্রকট। আসলে আমরা সবাই একই মন্ত্রে দীক্ষিত 'বিনা রক্তে সূচাগ্র মেদিনী নাহি দিব'। আমার বাড়ির চারপাশে হরেক রকমের পাখিদের নিয়েই আমার নিশিদিন যাপন। এদের মধ্যে প্রায় সব সময় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একদল ছাতারে। এদের সব সময় দলে থাকতে দেখি। এক একটি দলে প্রায় ৫-৭ জন থাকে। গাছের উপর এডাল থেকে সেডাল ঝাঁপিয়ে বেড়ায়। আর মাটিতে থাকলে লাফিয়ে চলে। এরা বেশিদূর উড়ে যেতে পারে না। ওড়ার ধরন দেখলে মনে হয় বেশ কষ্ট করে উড়ছে। সব সময় দেখেছি পাতার তলা উঠিয়ে পাতা ছিঁড়ে বা ডালের এদিক সেদিক ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করে কী খাবার পাওয়া যায়। অশ্বত্থ গাছের ফল পাকলে পাকা ফল খেয়ে ছড়িয়ে একসার করে। পোকামাকড় খাওয়া লক্ষ করে দেখেছি শুঁয়োপোকা বেশ যত্ন করে খায়। এরা কোন সময় স্থির থাকতে পারে না। কীসের যেন তাড়া। আর চুপ থাকে না এক মুহূর্তও। গ্রীষ্মের সময় স্নান করে বেশ গুছিয়ে। বর্ষায় কাকভেজা হয়ে বেশ যত্ন করে পালক শুকিয়ে নেয় ডানা মেলে আর ঘন ঘন গা ঝেড়ে। মাঝেমধ্যেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বেড়ে গেলে লড়াই শুরু হয়ে যায়। কিন্তু শেষমেশ দলেই থাকে। এদের সব সময় 'ক্যা-ক্যা' চিৎকার আর লাফানি দেখলে হাসিও পায়। চোখগুলো বেশ রাগিরাগি। তাই যখন শরীর ফুলিয়ে কটকটিয়ে তাকায় তখন মনে হয় এই সেই ছবির 'অ্যাঙ্গরি বার্ড', কেবল রঙের ফারাক। এখানে যা যা বললাম সব আমার বাড়ির আশপাশে থাকা ছাতারে পাখিদের নিয়ে। তবে এদের ছাড়াও এই পরিবারের আরও তিন সদস্যের সাথে পরিচয় হয়েছে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে পাখিদের সন্ধানে বেড়িয়ে। এইসব ছাতারে পাখিদের সম্পর্কে এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা হল।

জঙ্গল ব্যাবলার (Jungle Babbler)

এই পাখিটা নিয়ে কিছু বলতে গেলেই 'জঙ্গল ব্যাবলু' কথাটা মনে পড়ে যায় লালমোহন গাঙ্গুলির সৌজন্যে। যে পাখিটাকে সারাদিন ঘরের আশেপাশেই দেখি তার নাম জঙ্গল ব্যাবলার কেমন করে হল জানি না। এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Turdoides striata* আর অনেক কয়েকটা বাংলা নাম— ছাতারে, সাতভায়েরা, প্যাঙা প্যাঙি, ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ, কটা পাখি প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা এরা পাহাড়ের উঁচু অঞ্চল ছাড়া বাকি প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। এরা সাধারণত দলে থাকে। খুব কম সময় এদের একাকী থাকতে দেখেছি। বৃষ্টির দিনে লক্ষ করেছি বেশ বৃষ্টি হওয়ার পর বৃষ্টি থেমে যেতেই এরা সবার প্রথম বের হয়। আবার অনেক সময় জল রাখার পাত্রে বা সামান্য জমা জলে এরা খেলা করতে থাকে জল ছিটিয়ে। জঙ্গলে বা খোলা মাঠে খুব একটা দেখা যায় না। বেশিরভাগ সময় এই সদা চঞ্চল পাখিটি লোকালয় সংলগ্ন ঝোপঝাড়ে বা বাগানের মধ্যে ঝরা ডাল-পাতার মাঝে ঝাঁপিয়ে বেড়ায়। স্বভাবে চঞ্চল এবং সব সময়

মেঠো ছাতারে

ঝোপের মধ্যে মেঠো ছাতারে

ডাকাডাকিতে ব্যস্ত এরা ছোট ছোট লাফ মেরে চলে বেড়ায়। শুকনো পাতার ফাঁকে উল্টেপাল্টে দেখে খাবার আছে কিনা। যখন একটু বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় তখন এক ডাল থেকে লাফিয়ে অন্য ডালে গিয়ে কিছুটা সময় থেমে আবার কাছাকাছি অন্য গাছের ডালে লাফ দেয়। এরা খুবই সতর্ক থাকে। কিছু সন্দেহ হলে লুকিয়ে যায় ঝোপে। এদের ডাক বেশ কর্কশ প্রকৃতির। পায়ের ও ঠোঁটের রং হলুদ। চোখের রং ঘোলাটে সাদা এবং কনীনিকা গাঢ় বর্ণের। দেহ ঘিয়ে আর ধূসর রং মেশানো ধুলোমাটি রঙের। তলদেশ একই রকমের হালকা রঙের হয়। আকারে শালিক পাখির থেকে একটু বড় (২৫ সে.মি.) আর এদের লেজ লম্বা প্রকৃতির। এরা দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করে। দলছাড়া হয় না কখনও। সুখ দুঃখে একে অপরের সাথে থাকে। কেউ কোনভাবে বিপদে পড়লে অন্যেরা এসে উদ্ধার করে। এদের প্রজননের সময় ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর। এই সময় এরা গাছের ডালের খাঁজে চ্যাপ্টা বাটির মতো বাসা বানায়। ৩-৫টি উজ্জ্বল সবুজাভ নীল রঙের ডিম পাড়ে। কোকিল (Asian Koel), পাপিয়া (Common Hawk Cuckoo) আর চাতক (Pied Crested Cuckoo) পাখিরা এদের বাসায় ডিম পাড়ে। এরা প্রধানত পোকামাকড়, ফল, বীজ প্রভৃতি খেয়ে জীবন অতিবাহিত করে।

মেঠোছাতারে (Common Babbler)

যেমন সুন্দর দেখতে তেমন সুন্দর এদের ডাক। এরা মূলতঃ মাঠের পাখি। মাঠের মধ্যে থাকা ছোটখাটো ঝোপে এদের বাস। মাঠে গিয়ে এদের দেখা না পেলে মন ভার হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে ফাঁকা মাঠে তিতিরের বিহ্বল করা ডাকের মাঝে এদের সুরেলা ডাক মনে প্রশান্তি এনে দেয়। এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Turdoides caudate,* এরাও পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা। এদের বিস্তৃতি কিছুটা বিক্ষিপ্ত। শুকনো ঘাসবন, কাঁটাঝোপ বা পরিত্যক্ত কৃষিজমিতে এদের বাস। জঙ্গল ব্যাবলারের থেকে আকারে ছোট (২৩ সে.মি.) হলেও এদের লেজটি বেশ লম্বা। মাথা থেকে পিঠ অবধি আর ডানার রং ঘিয়ের সাথে বাদামি ও ধূসর মিশিয়ে। তার সাথে কালচে ছিট আর ছোপ থাকে। পিঠের উপরের ধারি দাগগুলোর জন্য অনেক সময় এদের ধারি ছাতারে মনে হয় কিন্তু দেহের রং, ডাক আর আকার থেকে সহজে ফারাক করা যায়। মেঠো ছাতারের গলা থেকে পেটের মাঝের অংশ অবধি সাদা রঙের আর তলপেট ঘিয়ে রঙের হয়। পা হলদে রঙের আর চোখের রং গাঢ় বাদামি। এরাও বেশ চঞ্চল আর সতর্ক প্রকৃতির পাখি। ন্যূনতম বিপদের আশঙ্কা হলে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। এদের সব সময় ছোট বড় দলে দেখা যায়। দলে থাকা একটি প্রথমে উড়ে গেলে এক এক করে বাকিরাও তাকে অনুসরণ করে আর একই জায়গায় গিয়ে মিলিত হয়। মাঝেমধ্যে কাঁটাগাছে বা ঘাসবনের ডগায় সরু ডালে বা দুটি ঘাসের শক্ত ডাঁটিতে ভর দিয়ে গলা উঁচিয়ে ডাকতে থাকে। মাটিতে কখনও নেমে এলে লাফিয়ে চলে। আমি খুবই কম সময় এদের খোলা মাঠে বা ফাঁকা জায়গায় মাটির উপর বসতে দেখেছি। পোকামাকড়, শস্যদানা, বীজ, ফল এদের খাদ্য। প্রজননকাল মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর। এই সময় এরা কাঁটাগাছে বা ঝোপের ভেতরে চ্যাপ্টা বাটির মতো বাসা বানায়। ৩-৪টি সবুজাভ নীল রঙের ডিম পাড়ে। এদের বাসাতেও অনেক সময় চাতক, পাপিয়া পাখিরা ডিম পেড়ে যায়।

হলদে-চোখ ছাতারে (Yellow-eyed Babbler)

এদের ইংরাজি নামের আক্ষরিক অনুবাদ করে এদের বাংলা নামটি ব্যবহার করা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের হিন্দি নামটি বহুল ব্যবহৃত। সেই সঙ্গে 'গুলাবচশম' নামটি বেশ সুন্দরও বটে। যাইহোক

হলদে চোখ ছাতারে

বিজ্ঞানসম্মত নামটি হল *Chrysoma sinense.* এদের দেখতে বেশ সুন্দর আর এরাও খুব ছটফটে। এদের ফাঁকা মাঠের মধ্যে ঘাসবনে বেশিরভাগ সময় দেখতে পেয়েছি। গুলাবচশম নামের কারণ এদের কমলা রঙের চোখের পাতা। এদের কণ্ঠস্বর বেশ মিঠে। বেশ সুরেলা

গান শোনায় মাঝেমধ্যে। দেহের উপরিভাগ (মাথা থেকে পিঠ অবধি, ডানা সমেত) আর লম্বাটে লেজের রং গাঢ় বাদামি। চোখের নীচের অংশ থেকে চিবুক, গলা ও পেট অবধি সাদা রঙের হয়। পায়ের রং হলুদ আর চঞ্চু কালো রঙের। এরা আকারে বুলবুলের (Red-vented Bulbul) থেকে ছোট (১৮ সে.মি.)। বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, মাকড়সা, শস্যদানা, বীজ, ফল প্রভৃতি এদের খাদ্য তালিকায় পড়ে। দলে থাকলে অনবরত বকতে থাকে আর মাঝে মাঝে মিষ্টি শিষ দেয়।

গুলাবচশমের সঙ্গত

এদের মাটিতে নামতে দেখিনি কখনও। ওড়ার ব্যাপারে এরা বেশ দুর্বল প্রকৃতির। এরাও পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা। মার্চ থেকে নভেম্বর মাস অবধি এদের প্রজনন কাল। প্রজনন কালে ঘাসের শক্ত কান্ডের মধ্যে চ্যাপ্টা বাটির মতো বাসা বানায়। বাসায় ৩-৫টা ঘিয়ে রঙের ডিম পাড়ে যার উপর লালচে ছোপ থেকে থাকে। এদের বাসায় অন্য পাখির ডিম পাড়ার কোন তথ্য নেই এখনও অবধি।

ডোরা ছাতারে (Striated Babbler)

ডোরা ছাতারে বা ছিটে বুক ছাতারে পাখিদের নাম থেকেই স্পষ্ট যে এদের গায়ে বেশ সুস্পষ্ট ধারি বা ছিট দাগ আছে। আকারে বুলবুল পাখির থেকে বড় (২১ সে.মি.)। এদের লেজটি ঝাটার মতো এবং লম্বাটে। এই পাখিটি আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে শুধুমাত্র দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় দেখতে পেয়েছি। দামোদর নদী সংলগ্ন এই অঞ্চলে থাকা লম্বা ঘাসের বনে এদের বাস। এই ঘন বনের মধ্যে থেকে বহু পাখির সাথে এদের ডাক শোনা গেলেও এদের দেখা মেলে তখন, যখন এরা ঘাসের বনের মাথায় উঠে আসে বা নুয়ে পড়া ডালে এসে বসে। এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Turdoides earlei.* এরাও দলে থাকতে পছন্দ করে। স্বভাবে লাজুক এবং সেই সঙ্গে চঞ্চল এই পাখিটিকে লক্ষ করা বেশ কঠিন কাজ। লম্বা লেজ যুক্ত এই পাখিটির মাথা, ডানা ও পিঠ ঘিয়ে বাদামির উপর কালচে বাদামি ছিট যুক্ত। এদের গলার কাছেও ছিট থাকে। চোখের রং হলুদ। চঞ্চু শক্তপোক্ত এবং ফ্যাকাসে হলুদ রঙের হয়। গায়ের রং ধূসর। এদের দেহের বর্ণ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মিশে যেতে সাহায্য করে। মার্চ থেকে অক্টোবর এদের প্রজনন কাল। এই সময় ঘাসের বা ঝোপের মধ্যে চ্যাপ্টা বাটির মতো বাসা বানায়। বাসায় ৩-৪টি হালকা নীল রঙের ডিম পাড়ে। এদের বাসাতে চাতকও পাখিরা ডিম পাড়ে।

বিভিন্ন পতঙ্গ আহার করে একদিকে যেমন পেস্ট নিয়ন্ত্রণ করে এরা তেমনি অন্যদিকে এরা ফল খেয়ে বীজ ছড়িয়েও উপকার করে। ছটফটে বাচাল এই পাখিগুলো না থাকলে মনে হয় যেন সবকিছু বিষাদময় হয়ে গেছে। পাখির কলতান আমাদের মনের মধ্যে নানান ভাবের সঞ্চার করে। তাই প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং মানসিক ভাবে আমরা পাখিদের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত সেই আদিকাল থেকে। কিন্তু দিন বদলে আমাদের অভ্যাস ও আবাসের পরিবর্তন হয়েছে। আজ আগ্রাসন সর্বত্র। একটুকরো ফাঁকা জমি ছাড়া চলবে না কোনমতেই। স্বীকৃত বন বা খাঁচাবন্দী চিড়িয়াখানা ছাড়া বন্যপ্রাণ অসুরক্ষিত। মাঝেমধ্যে ভাবি বাড়ির পেছনের পুকুরটা আর তাকে ঘিরে গাছগুলো আছে বলেই এত পাখির আনাগোনা আমাদের বাড়ির চারপাশে। এই যে অশ্বত্থ গাছটা আজ এত জীবের আবাসস্থল একে হারিয়ে ফেলব না তো কোনদিন। ভাবলেই বুকের ভেতরটা চিনচিন করে ওঠে। বাড়ির পাশের জল-জঙ্গল হোক বা ছোট ঝোপঝাড়, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের, নইলে অচিরেই হারিয়ে ফেলব আমাদের আশেপাশে থাকা অসংখ্য ছোট্ট বন্ধুদের।

তথ্যসূত্র :

১। বাংলার পাখি—অজয় হোম, পৃষ্ঠা-১৭৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫।

২। পশ্চিমবাংলার পাখি—প্রণবেশ সান্যাল এবং বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, পৃষ্ঠা-১০১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।

৩। সাধারণ পাখি—সেলিম আলি এবং লাইক ফতেহ আলি (অনুবাদ : নন্দিতা মুখোপাধ্যায়), পৃষ্ঠা-১২১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লি, ২০১৩।

৪। বাংলার পাখপাখালি (প্রথম খণ্ড)—কণাদ বৈদ্য, সন্দীপ দাস, শান্তনু প্রসাদ এবং ক্ষৌণীশ শঙ্কর রায়, পৃষ্ঠা-৫৪৫, ফরেস্ট ডুয়েলার্স, মালদা, ২০১৭।

৫। The Book of Indian Birds–Salim Ali, Pg.-326, Bombay Natural History Society, Oxford University Press, New Delhi, 2012.

৬। Birds of the Indian Subcontinent–Richard Grimment, Carol Grimmett, Carol Inskipp and Tim Inskipp, Pg.-528, Oxford University Press, New Delhi, 2014.

লেখক বিদ্যালয় শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: amarnayak.stat@gmail.com • M. 8001467741

জয়তী ঘোষ

অস্তিত্ব সংকটে নীল পাহাড়ের রাজা

আমাদের ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক ছোটো সংস্করণ। কি নেই আমার দেশে - পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, অরণ্য ভূমি, জলা ভূমি, ম্যানগ্রোভ - তালিকা আরও দীর্ঘতর। ভারত পৃথিবীর ১২ টি মেগাডাইভার্সিটি দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের ২.৫ লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতির ৪৫,০০০ রয়েছে ভারতে। আর একইভাবে ভৌগোলিক বৈচিত্র, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য,তাপমাত্রা প্রভৃতি ভারতের প্রাণীকূলকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয়তা প্রদান করেছে। সেই স্থানীয় প্রজাতিগুলি আমাদের সভ্যতার গর্ব আর বিশেষ ভালোবাসার জায়গা। তাদের মধ্যেই একজনের কথা আজ লিখতে বসেছি। তামিলনাড়ুর রাজ্যপশু নীলগিরি থর - পৃথিবীতে একমাত্র দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণে প্রায় ৪০০ কিমি বিস্মৃত অঞ্চল জুড়ে কেরল ও তামিলনাড়ু রাজ্যের খাড়া, পাথুরে ঘাসজমিতে একে খুঁজে পাওয়া যায়।

পরিণত পুরুষ নীলগিরি থর

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই ভীষণভাবে কমতে থাকে নীলগিরি থর এর সংখ্যা। বর্তমানে ভারতের এই অমূল্য সম্পদ Indian wildlife protection act– 1972 অনুসারে schedule one ভুক্ত লুপ্তপ্রায় প্রজাতি। অনিয়ন্ত্রিত শিকার, বনাঞ্চল ধ্বংস, চারণভূমিতে অন্য পশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা, ঘাসজমি অধিগ্রহণ করে ইউক্যালিপটাস মনোকালচার ক্রমান্বয়ে নীলগিরি থরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ঘাসের পরিবর্তে আগাছা উদ্ভিদের বাড়বাড়ন্তে নীলগিরি থরের আবাসস্থল হারিয়ে গেছে, তৈরী হয়েছে অস্তিত্বের সংকট।

নীলগিরি স্ত্রী থর

চেহারায় সাধারণ ছাগলের মতই দেখতে এরা কিন্তু লোমশ, দাড়িবিহীন এবং শিং ছোটো ও বাঁকানো । তাই এরা নীলগিরি আইবেক্স 'Ibex' বলেও পরিচিত। স্থানীয়রা ভালোবেসে ডাকে বড়াইয়ারু 'Varaiadu'। থরের তিনটি প্রজাতি আছে— হিমালয়ান থর, নীলগিরি থর ও আরবীয় থর। ২০০৫ সালের আগে নীলগিরি থর 'Hemitragus hylocrius' এবং হিমালয়ান থর 'Hemitragus jemlahicus' একই গণ ভুক্ত ছিল। বর্তমান গবেষণায় অন্য থর প্রজাতির সঙ্গে এদের পার্থক্য খুঁজে পাওয়ায় Ropoquet এবং Hassanin ২০০৫ সালে নীলগিরি থরের নতুন নামকরণ করেন Nilgiritragus hylocrius।

অতীতে এই প্রাণীটি সমগ্র পশ্চিমঘাট পর্বত অঞ্চলের পার্বত্য তৃণভূমিতে বিচরণ করত। খাড়া পাহাড়ে ১২০০ থেকে ২৬০০ মিটার উচ্চতায়

বিস্তীর্ণ ঘাসভূমি হল এদের চারণক্ষেত্র। ছোট, বড় নানারকমের ঘাস এদের প্রিয় খাদ্য। পাহাড়ের নীচু এলাকা ঘন অরণ্যে ঢাকা। পাহাড়ী ঘাসজমি ও অরণ্যের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সহাবস্থানকে শোলা বাস্তুতন্ত্র বলে। দক্ষিণ ভারতের তিন রাজ্য কেরালা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে এই পরিবেশে একদিকে তৃণভূমি 'grassland', পাশেই গুল্মবেষ্টিত অঞ্চল 'Shrub field' এবং সারি সারি বৃক্ষরাজির 'Forest' মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড, দুষ্প্রাপ্য সুগন্ধী ফুল, পাখি, প্রজাপতি এক স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরী করে। আর আছে নীলাকুরিঞ্জি ফুল - যার টানে ১২ বছর অন্তর হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসেন মুন্নারের আন্নামালাই পাহাড়ে, এরাভিকুলাম ন্যাশনাল পার্কে, সেই বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হতে।

এই সুন্দর নীল উপত্যকায় পুরুষ ও স্ত্রী থর তাদের সংসার গড়ে তোলে। পুরুষ থর স্ত্রী থরের থেকে আকারে ও ওজনে অনেকটাই বড় হয়। পরিণত পুরুষ থরের ওজন প্রায় ৮০ থেকে ১০০ কেজি আর লম্বায় ১০০ সেমি। মুখের দুপাশে কালো দাগ আর ঘন কালো, মায়াবী চোখ। স্ত্রী থরের ওজন প্রায় অর্ধেক - ৫০ কেজি, হালকা হলদেটে ধুসর বর্ণের আর ৮০ সেমি লম্বা। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে সহজেই চেনা যায় পিঠের গাঢ় ধুসর বর্ণের অংশ দেখে, তাই ডাকা হয় saddle back বলে।

এদের প্রজননকাল শুরু হয় জুন-আগস্টে, ভরা বর্ষায় । দীর্ঘ ৬ মাস সন্তান ধারণের পর নতুন শাবকের জন্ম হয় জানুয়ারী মাসে। অরণ্যে এদের আয়ুষ্কাল মাত্র সাড়ে তিন বছর তবে বন্দী প্রজননে (captive breeding) এরা নয় বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। এরা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে ছোট বা বড় দলে খুব ভোরে বা বিকেলবেলায় খাদ্য সন্ধানে বের হয়।

বর্তমানে কেরলের মুন্নার থেকে প্রায় ১৬ কিমি দূরে এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যানে (রাজামালা জতীয় উদ্যান) এই প্রাণীটিকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এই অঞ্চলটি একসময় কলোনিয়াল ব্রিটিশদের শিকারক্ষেত্র ছিল। ১৯৭১ এ কেরালা সরকার একে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৯৭৮ এ এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পায়। কেরলের ইদুক্কি জেলার প্রায় ৯৭ বর্গ কিমি বিস্মৃত এই পার্কে নিরবিচ্ছিন্ন তৃণভূমিতে নির্বিঘ্নে থরেরা ঘুরে বেড়াতে পারে। দক্ষিণের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আনাসুদিকে (২৬৯৫ মিটার উচ্চতা) এই পার্কেই অবস্থিত। আশার কথা আধুনিক সংরক্ষণ পদ্ধতিতে নীলগিরি থরের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৭০ সালে যা ছিল ১০০০, সংরক্ষণের ফলে ২০১০ এ সেই সংখ্যা ২৫০০-তে পৌঁছেছে। তবে নিশ্চিন্ত থাকার সময় আসেনি। মুন্নারের চা বাগান, পশ্চিমঘাটের মনোরম দৃশ্য, ঘন অরণ্য, নীলাকুরিঞ্জি আর নীলগিরির এই বিশেষ সদস্যটিকে আমরা যদি রক্ষা করতেই না পারি তাহলে ভারতবাসী হিসেবে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

নীলাকুরিঞ্জি ফুল

লেখক অধ্যাপক (জুওলজি) ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email:jayatizoology@gmail.com • M. 9433792263

প্রবীর বসু

মানবজাতি কি ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে?

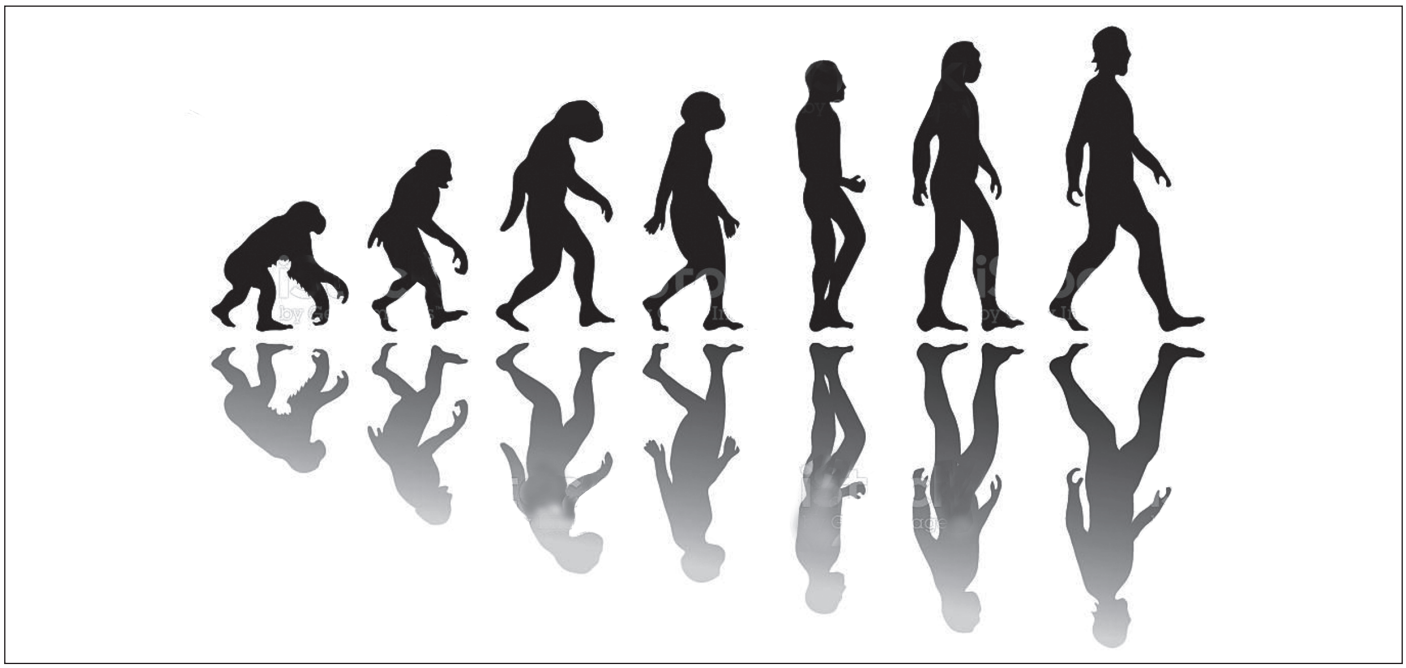

পৃথিবীর জন্ম প্রায় ৪৫০ কোটি বছর পূর্বে। আর পৃথিবীতে প্রাণ এসেছে তাও আজ প্রায় ২০০ কোটি বছর আগে। পৃথিবীতে প্রাণসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের অধিকাংশই আজ বিলুপ্ত। তবে প্রকৃতির সবচেয়ে উন্নত মানুষ এসেছে সবার শেষে মাত্র ১৫ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে। তবে মানব সভ্যতার সবচেয়ে পুরাতন যে নিদর্শন আমরা পেয়েছি তাও বড় জোর ১ লক্ষ ২০ হাজার বছর আগে। আসলে মানুষের উৎপত্তির শতকরা ৯৯.৫ ভাগ সময়েই সে ছিল অরণ্যচারী। প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষত বনে-জঙ্গলে বন্য পশু, জীবজন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে তার অস্তিত্ব বাঁচিয়েছে। কিন্তু তারপরই মানুষ পেয়েছে অসাধারণ বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, চিন্তা করবার ক্ষমতা। ধীরে ধীরে মানুষ বা মানব সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছচ্ছে। তবে একথা মানতেই হবে "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?"—কবির এই বাণীতো বিশ্বজগতের ক্ষেত্রে আজও চরম সত্য।

যে কোনও প্রজাতির সৃষ্টি, বিকাশ ও বিলুপ্তি ডারউইনের 'ন্যাচারাল সিলেকশন' মতবাদ অনুসারী এবং বিজ্ঞানী মহলে তা স্বীকৃত। যে বিশাল চেহারার ডাইনোসোর বা মানুষের পূর্বপুরুষ সবারই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং প্রকৃতির হাতেই রয়েছে নিয়ন্ত্রণ। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলা, তার শারীরবৃত্তিয় ও আচরণগত পরিবর্তন মানুষের মধ্যে দারুণ পরিবর্তন এনেছে। আর ২০ লক্ষ বছর ধরে মানুষের পূর্বপুরুষেরা কয়েকটি বিশেষ সাফল্য পেয়েছে যেমন দুপায়ে ভর দিয়ে খাঁড়াভাবে দাঁড়ানো। সূক্ষ্ম কাজ করবার জন্য স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন দুটি হাত, ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিশক্তি যুক্ত দুটি চোখ, উন্নত চিন্তা, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা যুক্ত মস্তিষ্ক এবং মনের ভাব প্রকাশের জন্য অসাধারণ বাকশক্তি। এই পাঁচটি বলে বলীয়ান মানুষ শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে প্রকৃতির ওপর নিজের কর্তৃত্ব বা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেছে।

তাছাড়া মানবজাতির উন্নয়নের সাথে সাথে প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করার ক্ষমতা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে বিপুলভাবে সাহায্য করছে। এছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি নবজাতকের মৃত্যুহার কমিয়েছে। এ সবের ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে হু-হু করে। দশ হাজার বছর আগে মানুষ যখন প্রথম আগুন ও অস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল তখন আমাদের

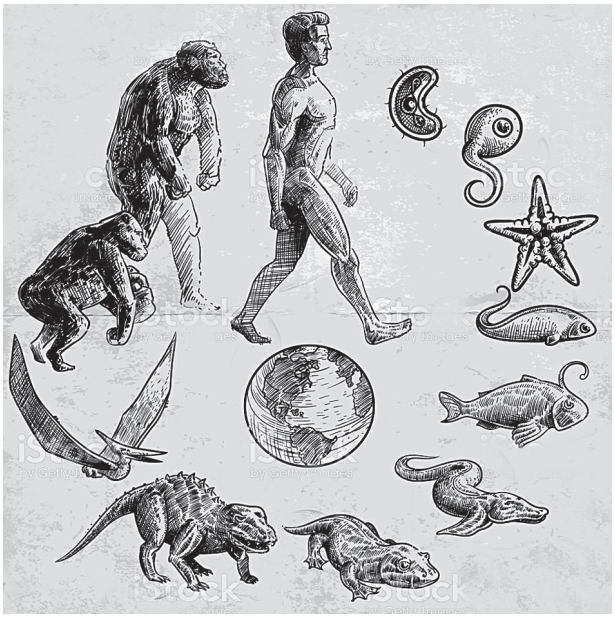

আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও ছিল ২৫০ কোটি আর আজ জনসংখ্যা ছাড়িয়েছে ৭৫০ কোটি।

তবে এত কিছুর পরেও বলতে হচ্ছে অনেক কিছু উন্নতির পাশাপাশি মানুষের অঙ্গসংস্থানগত ক্রমবিকাশ কিন্তু বন্ধ হতে চলেছে। কমছে দাঁতের সংখ্যা শরীরে লোমের পরিমাণ। যন্ত্র নির্ভরতা কমিয়ে দিয়েছে মানুষের পেশিশক্তি তাও আধুনিক মানুষের ক্ষেত্রে অনেকটাই কমে গিয়েছে। আসলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল, সেগুলির অব্যবহারে আমরা সবই হারাতে বসেছি। তবে ধরে রেখেছি কেবল মস্তিষ্কের বিস্ময়কর ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বলেই প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছি। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিতে সাধারণভাবে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখেছেন পূর্বপুরুষদের সমস্ত প্রজাতির ক্ষেত্রে গড় আয়ু কমছে। প্লিস্টোসিন যুগে ২ মিলিয়ন বছর পূর্বে যেখানে গড়ে প্রতি শতকে ০.০১টি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়, তা প্লিস্টোসিন যুগের শেষ ১ লক্ষ বছরে হয় ০.০০৪, ১৬০০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রতি শতকে ১৭টি এবং ১৯৮০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি দশকে ১৫টি অবলুপ্তি বাড়ছে মানেই গড় আয়ু কমছে। আসলে বিপদ সঙ্কেত আসতে শুরু করেছে অন্যদিক থেকে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিপদই হয়তো অদূর ভবিষ্যতে নিয়ে আসবে মানব প্রজাতির বিলুপ্তির ইতিহাস।

মানবজাতির বিলুপ্তির যে বিপদ সঙ্কেত পরিবেশ প্রতি মুহূর্তে পাঠাচ্ছে তাতে রয়েছে লাগামছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি। গত ৩০০ বছরে পৃথিবীর জল, মাটি, বাতাসের ভৌত, রাসায়নিক জৈবিক বৈশিষ্ট্য এতটাই পাল্টে দিয়েছে যে প্রকৃতির ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। এভাবেই প্রকৃতি থেকে মানুষ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের পরে যত প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে তার ৯৯ শতাংশই আজ বিলুপ্ত।

এতকিছু বিতর্কের মধ্যে এটা প্রমাণিত যে বিলুপ্ত প্রজাতিগুলোর বেশির ভাগই বিদায় নিয়েছে ধীরে ধীরে। বিজ্ঞানী স্টিন্ডেলই প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। তিনি

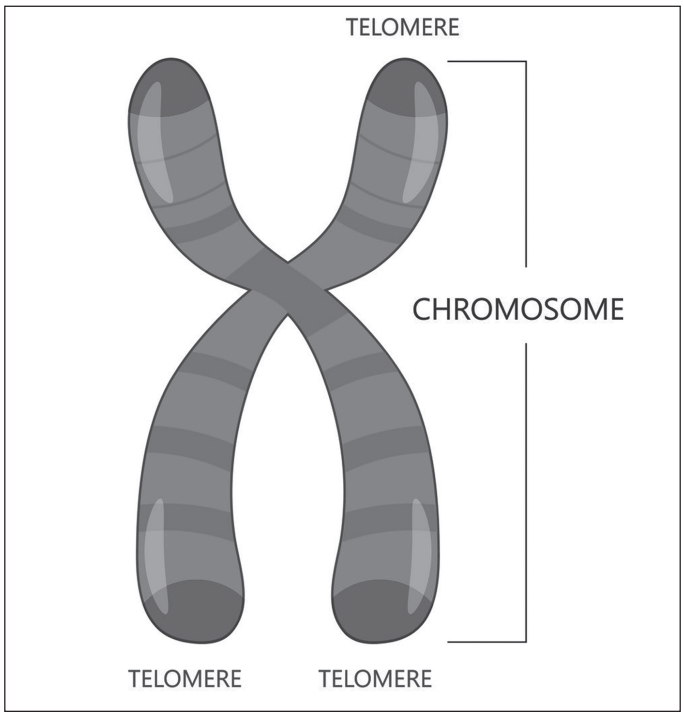

বলেন, প্রজাতির স্থায়িত্বের ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে ক্রোমোজোমের দুই প্রান্তে অবস্থিত টেলোমিয়ার। জুতোর ফিতের দুপ্রান্তে যেমন থাকে প্লাস্টিকের টুপি, প্রতিটি জীবের ক্রোমোজোমের দুপ্রান্তে রয়েছে বিশেষ গুণসম্পন্ন ক্রোমোজোমের অংশ টেলোমিয়ার। জীবদেহে প্রতিটি শেষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমেরও বিভাজন হয়। আর ঠিক এই কারণেই কোনো প্রজাতির প্রত্যেক প্রজন্মে টেলোমিয়ারের দৈর্ঘের একটি সূক্ষ্মতম অংশ হারিয়ে যায়। টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্য হ্রাস প্রজাতির বয়স সূচিত করে। টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্য যদি সঙ্কট মাত্রায় পৌঁছে যায় তখন সেই প্রজাতি ক্রোমোজোমের স্থায়িত্বহীনতাজনিত নানারকম রোগ যেমন ক্যানসার ও রোগ প্রতিরোধের অক্ষমতায় আক্রান্ত হয়। স্টিন্ডেলের মতে এভাবেই একটি প্রজাতির বিলোপ ঘটে।

স্টিন্ডেল আবার আশার বাণীও শুনিয়েছেন। কোনও প্রজাতির একটি গোষ্ঠী যদি টেলোমিয়ার ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে বেঁচে থাকা বাদ বাকি গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যে অন্তঃবিবাহ শুরু হয়, বন্ধ হতে চলা বিবর্তনগত ঘড়ি আবার চালু হয় টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্য বাড়ে আর এক নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। স্টিন্ডেলের এই তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানী মহলে কৌতূহল জাগিয়েছে। তবে স্টিন্ডেলের মত যদি সঠিক হয় তবে পৃথিবীতে মানুষই হবে একমাত্র প্রজাতি যারা টেলোমিয়ার দৈর্ঘ্য হ্রাস সঙ্কট মাত্রায় পৌঁছলে টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে নিজেদের অবলুপ্তি নিজেরাই ঠেকাতে পারবে। তবে সকলেই অপেক্ষাই রইল এ ভাবনার বাস্তবায়নের পক্ষে।

লেখক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মী ও ভ্রমণ বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক
email: prabirchandrabasu54@gmail.com • M. 9830676330

উৎপল মুখোপাধ্যায়

প্রথম ভারতীয় আকাশচারী

"কভু ভাবি পাখি হয়ে উড়িব গগনে
কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে"

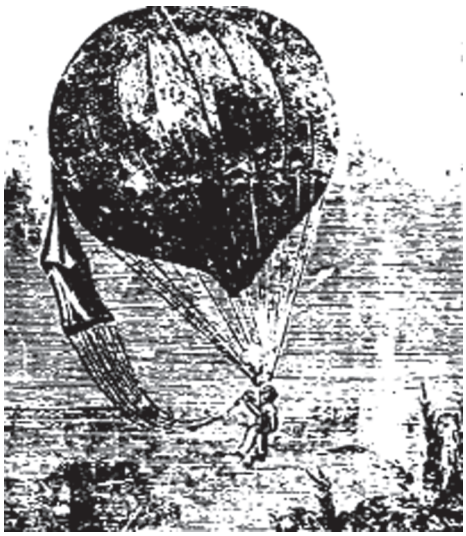

রবি ঠাকুরের এই কবিতা লেখার বহু আগে থেকেই মানুষ আকাশে ওঠার কথা ভেবেছে ও সেই কাজে সফলও হয়েছে। বাতাস গরম হলে হাল্কা হয়ে ওপরদিকে উঠে যায়—এই বিষয়টা বোধগম্য হওয়ার পর মানুষ গরম বাতাস ভরা বেলুনকে আকাশে ওড়ানোর চেষ্টা শুরু করে। প্রাচীন চিনদেশে ও হান বংশের রাজত্বকালে কুং লিয়াং প্রথম মানুষবিহীন গরম বাতাস ভরা বেলুন উড়িয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তবে আধুনিককালে ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে রাজা পঞ্চম জন-এর উপস্থিতিতে বার্তোলেমিউ দ্য গুসামো (১৬৮৫-১৭২৪) কাগজে তৈরি গরম বাতাস ভরা একটা বেলুনকে মাটি থেকে ৪ মিটার উঁচুতে তুলতে সমর্থ হন। ১৭৮৩ সালের ৪ জুন দুই ভাই জোসেফ-মিচেল মগলফিঁয়ে (১৭৪০-১৮১০) এবং জ্যাক-এটিয়েন মগলফিঁয়ে (১৭৪৫-১৭৯৯) প্রথম জনসমক্ষে প্রাণীবিহীন ১১ মিটার ব্যাসের গরম বাতাস ভরা বেলুন ওড়ান। ঐ বছরেই ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁদের বেলুন *Aerostat Revellion* একটা ভেড়া, একটা পাতিহাঁস ও একটা মোরগকে নিয়ে আকাশে ওড়ে। এটাই প্রথম জীবন্ত প্রাণীসহ বেলুনের উড়ান। এর ঠিক এক মাস পর ১৯ অক্টোবর বিজ্ঞানী পিলাত্রে দ্য রোজিয়ের (১৭৫৮-১৭৮৫), জাঁ ব্যাপটিস্ট রিভেলিয়ন (১৭২৫-১৮১১) এবং গিরোড দ্য ভিলেট প্রথম মানুষ হিসেবে বেলুনে চড়ে আকাশে ওঠেন। ১৭৮৫ সালের ৭ জানুয়ারি জাঁ-পিয়ের ব্ল্যানকার্ড (১৭৫৩-১৮০৯) ও জন জেফ্রিস (১৭৪৪-১৮১৯) প্রথম বেলুনে চড়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হন। কিন্তু দুর্ঘটনা প্রবণতার জন্যে ক্রমশ গরম বাতাস ভরা বেলুনের ব্যবহার কমে যায়।

অন্যদিকে ১৬৬২ সালে রবার্ট বয়েল (১৬২৭-১৬৯১)-এর গ্যাসের চাপ ও আয়তন সংক্রান্ত সূত্র ও ১৭৬৬ সালে হেনরি ক্যাভেন্ডিস (১৭৩১-১৮১০)-এর হাইড্রোজেন গ্যাস সম্পর্কে গবেষণার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানী জোসেফ ব্লাক (১৭২৮-১৭৯৯) বলেন যে বেলুনে গ্যাস ভরে শূন্যে ওড়ানো যেতে পারে। তখন বিজ্ঞানী জ্যাক চার্লস (১৭৪৮-১৮২৬) হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা বেলুন ওড়ানোর কথা চিন্তা করেন। তারই ফলস্বরূপ চার্লস এবং রবার্ট ভ্রাতৃদ্বয়—অ্যান-জাঁ রবার্ট (১৭৫৮-১৮২৬) ও নিকোলাস লুইস রবার্ট (১৭৬০-১৮২৩) ১৭৮৩ সালের আগস্ট মাসে মানববিহীন হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা বেলুন ওড়ান। ঐ বছরেরই ১ ডিসেম্বর চার্লস ও রবার্ট ভাইয়েরা প্রথম মানববাহী হাইড্রোজেন বেলুনের যাত্রী হয়ে আকাশে পাড়ি দেন।

ক্রমশ বেলুন আরোহণ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস-এ পরিণত হয় ও পয়সা রোজগারের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। বেলুন চড়ার হিড়িক একসময় ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতেও এসে পৌঁছায়। এদেশে ১৮৩৬ সালে প্রথম বেলুন চড়ে আকাশে ওড়েন ডি. রবার্টসন। তাঁর বেলুন কলকাতার মুচিখোলা (বর্তমান গার্ডেনরিচ অঞ্চল) থেকে উড়েছিল। ১৮৮০-র দশকে বিখ্যাত বেলুন আরোহী পার্সিভার স্পেনসার (১৮৬৪-১৯১৩) ভারতে এসে নানা জায়গায় বেলুন আরোহণের প্রদর্শনী করেন। সেই সুবাদে ১৮৮৯ সালের অবতারচন্দ্র সাহা ও অনীল চন্দ্র ব্যানার্জী স্পেনসারের কাছে গিয়ে তাঁর কাছে বেলুন চড়ার শিক্ষানবীশী করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁদের ইচ্ছে পূরণ হয়নি। তবে অবতারচন্দ্রের মাধ্যমে স্পেনসারের সঙ্গে রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়। রামচন্দ্রের বাড়ি ছিল কলকাতার শিমুলিয়া অঞ্চলের কাসরিপাড়ায়। তিনি জিমনাস্টিক ও ট্রাপিজের খেলায় পারদর্শী ছিলেন এবং নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল সার্কাস-এ নিজের কৌশল দেখতেন। তিনি সরকারি নর্মাল স্কুলের জিমনাস্টিক্স-এর শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন। পরবর্তীকালে রামচন্দ্র গ্রেট ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান সার্কাস-এর ডিরেক্টর হন।

স্পেনসার সাহেব ৫০০ টাকার বিনিময়ে রামচন্দ্রকে বেলুন চড়ার কৌশল শেখান। ১৮৮৯ সালের ১০ এপ্রিল নারকেলডাঙার ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির অধিকর্তা ডি. কোটস নিভেন-এর তত্ত্বাবধানে স্পেনসারের *দি ভাইসরয়* নামক বেলুনে গ্যাস ভরা হয়। তারপর স্পেনসার ও রামচন্দ্র ঐদিন ঐ বেলুনে চড়ে গ্যাস কোম্পানির মাঠ থেকে আকাশে ওঠেন। বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে রওনা হয়ে এক ঘন্টা পরে বারাসাতের তিন মাইল দূরে পালপাকিরা-কাজিপাড়া গ্রামে এসে বেলুনটা মাটিতে নামে। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-ই প্রথম ভারতীয় যিনি বেলুন চড়ে আকাশ পরিক্রমা করেন।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রামচন্দ্র একলা বেলুনে চড়ার পরিকল্পনা করেন। তিনি স্পেনসারের কাছ থেকে *দি ভাইসরয়* বেলুনটা কিনে নিয়ে তার নামকরণ করেন *দি সিটি অফ ক্যালকাটা*। পাথুরিঘাটার জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮)-এর মাতুল সম্পর্কিত নাতি গোপালচন্দ্র মুখার্জী রামচন্দ্রকে বেলুনযাত্রার ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা করেন। এছাড়া রামচন্দ্রের বেলুন উড়ান প্রদর্শনীর দর্শকদের জন্যে

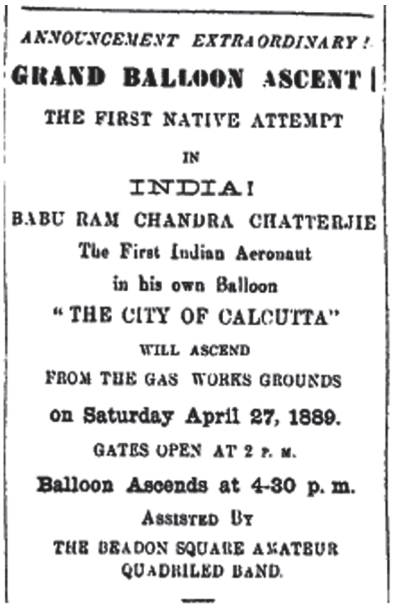
ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY!
GRAND BALLOON ASCENT!
THE FIRST NATIVE ATTEMPT
IN
INDIA!
BABU RAM CHANDRA CHATTERJIE
The First Indian Aeronaut
in his own Balloon
"THE CITY OF CALCUTTA"
WILL ASCEND
FROM THE GAS WORKS GROUNDS
on Saturday April 27, 1889.
GATES OPEN AT 2 P. M.
Balloon Ascends at 4-30 p. m.
ASSISTED BY
THE BEADON SQUARE AMATEUR
QUADRILED BAND.

টিকিটের দাম ধার্য হয়েছিল ৪ আনা থেকে ৩ টাকা পর্যন্ত। গ্যাস কোম্পানির সহকারী ম্যানেজার জে. রিড বেলুনে গ্যাস ভরার তদারক করেন। ১৮৮৯ সালের ৪ মে বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে ৮০০০ দর্শকের সামনে রামচন্দ্র একলা *দি সিটি অফ ক্যালকাটা* বেলুনে চড়ে আকাশচারী হন। প্রায় ৪০ মিনিট ভেসে থাকার পর সোদপুরের কাছে নাটাগড়ে রামচন্দ্রের বেলুন অবতরণ করে। ১১ মে-র *দি বেঙ্গলী* কাগজে রামচন্দ্রের বেলুনযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ঐ কাগজে গর্বের সঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে রামচন্দ্রের এই কৃতিত্ব 'বাঙালিরা ভীতু' এই অপবাদ দূর করেছে। নেবুতলা *ইয়ং ম্যানস ক্লাব* রামচন্দ্রকে অভিনন্দন জানায়। সুতরাং রামচন্দ্রের বেলুন চড়া পরাধীন জাতির বুকে সাহস যুগিয়েছিল।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই স্পেনসার বেলুন আরোহী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্যে *চ্যাটার্জী বেলুন কোম্পানি* তৈরি করেন রামচন্দ্র। ১৮৮৯ সালের ২৭ জুন তিনি এলাহাবাদের খসরুবাগ-এ দ্বিতীয়বার একক বেলুন আরোহণ করেন। এই বেলুন উড়ানের সময় রামচন্দ্র যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন। তাঁর এই সাহসিকতার কথা *হিন্দু পেট্রিয়ট ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, মর্নিং পোস্ট* প্রভৃতি খবরের কাগজে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। এরপর দুঃসাহসী রামচন্দ্র বেলুন চড়ে আকাশে উঠে প্যারাসুটের সাহায্যে অবতরণের পরিকল্পনা করেন। ১৮৯০ সালের ২২ মার্চ তিনি কলকাতার মিন্টো পার্কের কাছে টিভোলি গার্ডেন-এ বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেলুনে করে ৩৫০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত উঠে প্যারাসুটে করে নিচে নেমে আসেন। রামচন্দ্রই প্রথম ভারতীয় যিনি এই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রামচন্দ্রের প্যারাসুটে অবতরণের দর্শকদের মধ্যে ছিলেন পার্সিভাল স্পেনসার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭)-এর মতো বিখ্যাত মানুষ। ১৮৯০-এর নভেম্বরে রামচন্দ্র দিল্লির তিস হাজারিতে প্যারাসুটে অবতরণ করেন। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ নবাব জালাল-উস্-দৌলা মহম্মদ মুমতিয়াজ আলি খান-এর তরফ থেকে রামচন্দ্র সম্মানজনক পুরস্কার পান।

১৮৯১ সালের শুরুর দিকে লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে বেলুন আরোহণ প্রদর্শনের পর নভেম্বরে রামচন্দ্র ইন্দোরের মহারাজার অনুরোধে ভাইসরয়ের উপস্থিতিতে বেলুনে আরোহণ ও প্যারাসুটে অবতরণ করেন। ১৮৯২ সালে আগ্রা সহ নানা জায়গায় আরোহণ -অবতরণ প্রদর্শন করে রামচন্দ্র প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, ১৮৯২ সালের এপ্রিল মাসে বারানসীতে বেলুন আরোহণ করে নামার সময় পাহাড়ে ধাক্কা লেগে রামচন্দ্র গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ১৮৯২ সালের ৯ আগস্ট গোপালচন্দ্র মুখার্জীর বাড়িতে রামচন্দ্র মারা যান।

রামচন্দ্রের প্রয়াণের পর তাঁর বেলুন আরোহণের উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যান প্রবোধচন্দ্র লাহা। রামচন্দ্র বেঁচে থাকার সময়েই ১৮৯০ সালে প্রবোধচন্দ্র স্পেনসার সাহেবের কাছে বেলুন চড়ার কায়দা শেখেন। লাহাও একজন জিমন্যাস্ট ছিলেন ও হরিমোহন রায়ের সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাতেন। ১৮৯০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি স্পেনসার ও আরও তিনজন সহযাত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে প্রবোধচন্দ্র টিভোলি গার্ডেন থেকে বেলুনে চড়ে আকাশে ওঠেন। এর কয়েক সপ্তাহ পরে ৮ মার্চ ঐ মাঠ থেকেই লাহা একলা বেলুন আরোহণ করেন। ১৮৯২ সালের মার্চ মাসে প্রবোধচন্দ্র কানপুরে বেলুনে আরোহণ প্রদর্শন করেন। তিনি সারা ভারতে কুড়িটারও বেশি বেলুন আরোহণ এবং প্যারাসুটে অবতরণের প্রদর্শনী করেন। তাঁকে এ ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা করেন লালবিহারী সাহা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)-এর জামাতা বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তৃতীয় ভারতীয় বেলুন আরোহী। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যে বেলুনে চড়ে আকাশে উঠেন।

বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির যুগে বেলুনে চড়া অনেকের কাছেই অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। ঝুঁকিও অনেক কম। তাই বিভিন্ন পর্যটন স্থানে অর্থের বিনিময়ে বেলুনে চড়া যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেলুন আরোহণ খুব সোজা ব্যাপার ছিল না, বিপদ ছিল পদে পদে। তাই পরাধীন ভারতবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে অসমসাহসী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এদেশে প্রথম বেলুনে আকাশ পরিক্রমা করে ব্রিটিশ শাসকের হাতে মার খাওয়া মানুষদের বুকে সাহস যুগিয়েছিলেন। ভারতবাসী বুঝেছিল যে চেষ্টা করলে তারাও ইংরেজদের সমকক্ষ হতে পারে। এইখানেই রামচন্দ্রের কৃতিত্ব। সবশেষে এটা উল্লেখ করা যায় যে রামচন্দ্রের প্রথম বেলুন চড়ার বছর অর্থাৎ ঐ ১৮৮৯ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মোহনবাগান ক্লাব যারা ১৯১১ সালে গোরাদের ইস্ট ইয়র্ক-কে হারিয়ে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে আইএফএ ফিল্ড জিতে ভারতবাসীকে ব্রিটিশ শাসকের চোখে চোখ রেখে লড়াই করার স্পর্ধা দিয়েছিল।

তথ্যসূত্র :

1. First solo balloon flier–Abhijit Dasgupta : The Telegraph, 8 August, 2012.
2. How the hot-air balloon transformed the Bengali character in the 19th century–Sarbajit Mitra, 6 April, 2015, SKY HIGH, scroll.in.
3. Wikipedia.
4. ballonfiesta.com.
5. getbengal.com.

লেখক প্রাক্তন শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: utpalsbv@gmail.com • M. 9830518798

শিবম ব্যানার্জী

প্রাণের নদী কুশকর্ণী

বীরভূমের এক ছোট্ট গ্রাম, নাম তার সাহাবাদ। একসময় সেখানে ছিল প্রচুর কুশগাছ। তারই কোল বেয়ে উৎপত্তি হয়েছে এক নদী। নদীর নাম কুশকর্ণী। প্রথমে এই নদীর প্রবাহ ছিল খুবই সুন্দর। বর্ষার সময় দেখা দিত বন্যা। এই নদী সাহাবাদ থেকে উৎপত্তি হয়ে মিশেছে বীরভূমেরই এক প্রিয় নদী ময়ূরাক্ষীতে। সাহাবাদের মানুষজন গ্রাম্য কথায় এই নদীকে বলে ঘা-ঘা নদী। কুশকর্ণী নদী সাহাবাদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে রাজনগরের ছোটোবাজার, মীরপুর, আড়ালি গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়ে লাউজোর, গামারকুন্ডু, হরিপুর হয়ে মিশেছে খটঙ্গা গ্রামে। এই নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩ কিমি। একসময় কুশকর্ণী নদীর সৌন্দর্য ছিল বেশ এবং চওড়ায় ছিল প্রায় ৫০-১০০ ফুট। এই নদী ছিল গ্রামের মানুষজনের নিকটে আশা-ভরসা, যা এখনো আছে।

যদিও এখনো কুশকর্ণী নদীর উপর সকলের আশা-ভরসা আছে কিন্তু ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এই নদী। প্রাণের কুশকর্ণী প্রথমে যতটা চওড়া ছিল এবং এর প্রবাহমাত্রা যতটাই বেশি ছিল, এখন তা ততটাই কমে গিয়েছে। এবিষয়ে গ্রামের মানুষজন প্রধান কারণ হিসাবে বলেন যে নদী থেকে অতিমাত্রায় বালি তুলে তা বালির খাদানে জমা করা হচ্ছে। ফলে নদীতে বালির পরিমাণ কমছে এবং নদীতে জলের মাত্রাও কমছে। কারণ বালি জল ধরে রাখতে সক্ষম এবং নদীর সৌন্দর্য নদীতে বালির পরিমাণ দ্বারাও বিচার করা সম্ভব। এছাড়াও নদীর দুপাশে গড়ে তোলা হয়েছে প্রচুর সংখ্যক ইটভাটা, যার কারণে কুশকর্ণী আজ মৃত্যুর পথে। একসময় এই নদীর জল ব্যবহৃত হতো সেচের কাজে, গ্রামের মৎসজীবীরা মাছ ধরত নদী থেকে কিন্তু এখন এসবই প্রায় কমে গিয়েছে। যে নদী একসময় জলে পরিপূর্ণ থাকত সেই নদী বর্তমানে পরিণত হয়েছে এক নালায়। দেখা গিয়েছে নদীর প্রস্থ প্রায় অনেকটাই কমে গিয়েছে।

"কুশকর্ণী নদীকে তার পুরোনো জীবন ফিরিয়ে দিতে হবে" এই দাবিতে ৩-৪ ডিসেম্বর(২০২২) এক পদযাত্রার আয়োজন করে 'কুশকর্ণী নদী সমাজ' আশ্রম। এই পদযাত্রায় সমবেত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নানান পরিবেশকর্মীরা। 'কুশকর্ণী নদী সমাজ' আশ্রম থেকে শুরু করা হয়েছিল এই পদযাত্রা। প্রথমে নদীর পার দিয়ে হেঁটে সকল পদযাত্রীরা উপস্থিত হয়েছিল ছোটোবাজার ব্রিজে। তারপর নির্দিষ্ট পথ দিয়ে হেঁটে সকলে পৌঁছান আড়ালি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং সেখানে বক্তব্য রাখেন নদী বাঁচাও জীবন বাঁচাও আন্দোলনের কিছু কর্মীরা সাথে আড়ালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। এই দুদিনের পদযাত্রায় নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে ভোজনের আয়োজনও করা হয়। ৩ ডিসেম্বর আন্দোলনের

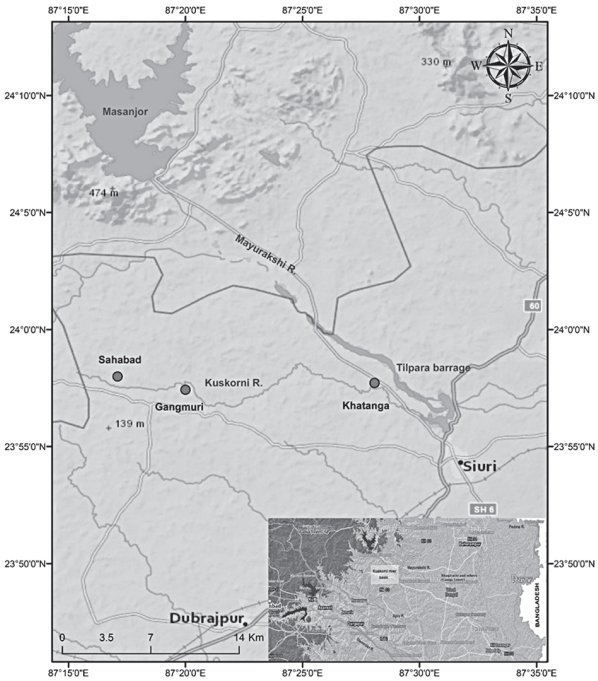

কর্মীরা রাত কাটান হরিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরদিন পুনরায় যাত্রা শুরু হয় এবং খটঙ্গা গ্রামে ওই পদযাত্রা শেষ হয়। অবশেষে সেখানে আয়োজন করা হয় কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

লেখক একাদশ শ্রেণির ছাত্র

email: shibambanerjee87@gmail.com • M. 8207211035

সংবাদ

বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচি ২০২২

১৯ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের বিজ্ঞান প্রসারের আর্থিক সহযোগিতায় বিজ্ঞান দরবারের ব্যবস্থাপনায় পলাশি আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুলে সারাদিন ব্যাপী বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। হাতেকলমে বিজ্ঞান প্রবন্ধ, ক্যুইজ ও অঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে সকলকে শংসাপত্র ও বই পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষিকা ড. মাধবী ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

পেস (PASE)-এর সভা

১০ ডিসেম্বর পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স এন্ড এনভাইরনমেন্ট-এর (পেস) সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বেলগাছিয়া প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের আর. কে. ভি. ওয়াই. সভাঘরে উদ্‌যাপন করা হয়। সংগঠনের বিভিন্ন সদস্যরা বৈজ্ঞানিক মেজাজ তৈরির স্বপক্ষে প্রচার চালানোর ওপর জোর দেন। সভাপতি ড. অশোককান্তি সান্যাল ও সম্পাদক ডা. সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার সহ অন্যান্য বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

বই প্রকাশ
'আমরা সবাই তারার অংশ'

২৭ নভেম্বর ২০২২ কুচবিহারের ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজে 'আমরা সবাই তারার অংশ' বইটি প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. অনিরুদ্ধ বর্মন। বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানী ড. বিবেক বাগচি, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র লস্কর, ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, ড. তপন দাস ও সুবিনয় পাল প্রমুখ। বইটির প্রকাশক বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনা। বইটি প্রকাশ করেন সবিতা চক্রবর্তী। বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় ছাড়াও এই দিনের আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনার তরফ থেকে পত্রিকা ও পুস্তকের স্টল।

বাঁদিক থেকে শ্রাবণী ঘোষ চক্রবর্ত্তী, সুতপা ঘোষ, মিতা ভাদুরী আচার্য্য, শিল্পী দাস

জৈবমেলা ২০২২

গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ৯-১১ ডিসেম্বর তিনদিন ব্যাপী এক জৈবমেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলায় জৈবসারের বিভিন্ন কৃষিজ ফসল প্রদর্শণী ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়।

BIGYAN ANNESWAK VOL : 20 Issue No. 1 January-February 2023 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 20-
ISSN 2582-5674

রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী : বামনবরাহ
সাধারণ ইংরাজি নাম : Pygmy Hog
বিজ্ঞানসম্মত নাম : Porcula salvania

অত্যন্ত দুর্লভ এই বামনবরাহ হিমালয়ের পাদদেশের ঘেসো বনভূমির প্রাণী হলেও আজ কেবলমাত্র আসামের মানস জাতীয় উদ্যান এবং ভুটানের দক্ষিণ বনাঞ্চল কিছু জায়গায় সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন মেরেকেটে ২৫০টি পূর্ণবয়স্ক এই প্রাণী বেঁচে রয়েছে সারা বিশ্বে। IUCN-এর লাল তালিকা অনুযায়ী এরা তীব্রভাবে সংকটাপন্ন জীব। এরা ভারতীয় বন্যপ্রাণী আইন ১৯৭২-এর তপশিল-১ তালিকাভুক্ত প্রাণী। এই মুহূর্তে বিলুপ্তির প্রহর গুনছে এরকম প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম এরা।

সরিসৃপ : বাংলার আচ্ছাদিত কাছিম
সাধারণ ইংরাজি নাম : Bengal roof turtle or Red crowned roofed turtle
বিজ্ঞানসম্মত নাম : Batagur kachuga

এরা দুর্লভ প্রজাতির কাছিম। কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে এদের বাস তার মধ্যে ভারত অন্যতম। এরাও তীব্র সংকটাপন্ন একটি প্রজাতি। পুরুষদের চাইতে মেয়েরাই বড় হয়—প্রায় ২৫ কে.জি. পর্যন্ত ওজন হতে পারে। সারা বিশ্বে প্রায় চারশোর মত বেঁচে থাকতে পারে বলে অনুমান। এদের কৃত্রিম আবদ্ধ প্রজনন শুরু করা হয়েছে।

পক্ষী : ভারতীয় শকুন
সাধারণ ইংরাজি নাম : Indian Vulture
বিজ্ঞানসম্মত নাম : Gyps indicus

শকুনের এই প্রজাতিও বিলুপ্তির দোরগোড়ায়। মূলতঃ ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের বাসিন্দা এই প্রজাতির শকুনকে ২০০২ সালেই IUCN-এর লাল তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এদের শতকরা পচানব্বই ভাগই আজ বেঁচে নেই। গবাদি পশুর ব্যাথা উপশমকারী ওষুধ 'ডাইক্লোফেনাক'—এদের ধ্বংসের মূল কারণ।

মাছ : পন্ডিচেরি হাঙর
সাধারণ ইংরাজি নাম : Pondicherry Shark
বিজ্ঞানসম্মত নাম : Pondicherry Shark

অত্যন্ত দুর্লভ এই হাঙর কিছুদিন পূর্বেও লুপ্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ২০১৯ সালে এর পুনরায় পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তাই IUCN-এর লাল তালিকায় এরা তীব্রভাবে সংকটাপন্ন জীবরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। সাধারণতঃ এক মিটার-এর বেশি বড় হয় না এই হাঙরগুলো। এরা অত্যন্ত কম সংখ্যায় বেঁচে আছে। সারা পৃথিবীতে মাত্র ২০টির মত বেঁচে থাকতে পারে। সত্তরের দশকে লুপ্ত হয়ে গেলে ২০১১ সালে শ্রীলঙ্কার মেনিকগঙ্গা নদীতে একে ধরা হয়। পৃথিবীর ২৫টি 'Most wanted species'-এর মধ্যে এটি একটি অন্যতম প্রজাতির হাঙর।

email : rajarouthbhbl@gmail.com M. 9474417178